Indian Science News Association
ESTD.–1935

বিজ্ঞান কথন

কলকাতা/ অক্টোবর ৬, ২০২১, বুধবার, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

বি P V প্র

আমাদের যাত্রা হল শুরু

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আমরা আরম্ভ করি শেষ করিনা, আড়ম্বর করি, কাজে করিনা, যাহা অনুশীলন করি তাহা বিশ্বাস করিনা, যাহা বিশ্বাস করি তাহার পালন করিনা....

গুরুদেবের চরণে আড়ম্বি প্রণত হয়েই জানাতে চাই আমরা রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি যাঁরা তাঁরা একটু অন্যপথেই চলার চেষ্টা করি। যে পথের উদ্গাতা মহান বিজ্ঞানী এবং ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্র পাঠ এবং গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বা দেশে বিজ্ঞান চর্চার জনক, মহামহিম আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসু বা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মেঘনাদ সাহা প্রমুখ প্রথিতযশা ভারতমাতার সুযোগ্য সন্তানেরা।

ওঁরা চেয়েছিলেন বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দিতে, জীবন থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দুর করতে, দেশকে আরও সম্যকভাবে জানাতে এবং সকলের কাছে আরও পরিচিত করাতে। নাহলে ওঁদের প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সায়েন্স এ্যান্ড কালচার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গত ৮৭ বছর ধরে প্রকাশিত হতে পারতনা। ওঁদের সামনে বাধা এসেছে, ওঁরা অসুবিধার সম্মুখীনও হয়তো হয়েছেন তবুও ওঁরা থেমে জাননি, নিরুৎসাহিত হননি।

একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এই এ্যসোসিয়েশন বিগত ৩৪ বছর ধরে তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে চলেছে। হাতে কলমে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার পাঠ দিয়ে চলেছে। এইসব স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আজ অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সাংবাদিক। ওঁদের মূললক্ষ্য একটাই বিজ্ঞানের জন প্রিয়করণ!

কিন্তু সময়েরও পরিবর্তন হচ্ছে! গণমাধ্যমেও পরিবর্তন হয়েছে। সংবাদপত্র, দুরদর্শনের বেড়া ডিঙিয়ে আজ নতুন সময়ের দ্যোতক সমাজমাধ্যম। কচিকাঁচা থেকে পক্কেশ আজ সবাইকে যোগাযোগ রাখতে হয় মোবাইল ফোনের সাহায্যে। গত দুবছরের পৃথিবীব্যপ্ত মহামারী প্রাণ কেড়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের, বদলে দিয়েছে মানবসভ্যতার সমস্ত সমীকরণ। আজ শিক্ষার মাধ্যম ল্যাপটপ, প্রাণ সংকটে চিকিৎসার ঠিকানা ঐ মোবাইল ফোন। দেশের কর্ণধাররাও চাইছেন মানুষ এই নতুন মাধ্যমেই অভিষিক্ত হোক,সম্পৃক্ত হোক।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতা লাভের পর আমরা ৭৫তম বর্ষে উপনীত হয়েছি। জীবনযাত্রায় হয়তো আমরা অনেক কষ্টের মুখোমুখি হয়েছি। কোনকিছুই হয়তো অতি সহজে আমাদের নাগালের মধ্যে আসেনি। কিন্তু সভ্যতার এই সংকটকালে, দেশের এই সন্ধিক্ষণে নতুন কোন কিছু করার ডাকে আমরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছি। মনে হয়েছে আমাদেরও কিছু করতে হবে। তাই বিজ্ঞান কহন। প্রবীণের মনন এবং নবীনের চিন্তনের মিলনের এক অনন্য প্রয়াস। একটু আলাদা, একটু অন্য রকম। সবাই যাতে বিজ্ঞানের পরশ পায়, বিজ্ঞানকে বুঝতে পারে। এর জন্য ভারী বইয়ের পাতা খোঁজার দরকার নেই, প্রয়োজন নেই অভিধান অনুসন্ধানের। কারণ বিজ্ঞান কহনের মধ্যে বিজ্ঞানের গালভরা তত্ত্ব, তথ্য থাকবেনা, সম্পাদ্য, উপপাদ্যও থাকবে না। হাতে মুঠোফোনের পর্দায় সহজবোধ্য বিজ্ঞানের আলোচনা, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান কহন চলবে তার অগ্রজ সায়েন্টিফিকা কম্যুনিকার আদর্শ অনুসরণ করে যার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষ উদযাপনের দিনে। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে যাতে বিজ্ঞান কহন রাজনীতির পীঠস্থান না হয়ে ওঠে, স্থান না পায় কোন মতাদর্শবাদী বক্তব্য।

বিজ্ঞান কহনের আদর্শ হবে একটাই। বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্যের অনুসন্ধান, মিথ্যার অপসারণ। সংবাদে জানা গিয়েছে চলতি করোনা মহামারীতে এই রোগ নিয়ে যত মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ হয়েছে, তার অধিকাংশই ভারতবর্ষ থেকে। এ অত্যন্ত দুঃখের, অত্যন্ত লজ্জার। আমরা কি এগিয়ে চলেছি না পশ্চাদপসরণ করছি? এখানেই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিজ্ঞান কহন মিথ্যার বেসাতিতে প্রশ্রয় না দেয়, অতিরঞ্জন না করে।

আমরা জানি কোন নতুন কিছু শুরু করতে গেলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়, তিক্ততার সৃষ্টি হয়, অনেক সময় সমালোচনার মুখ বন্ধ করা যায়না। আবার ওও জানি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ কাঁচা আমের রসটা অম্ল রস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে।

অতএব, বিজ্ঞান কহন আপন পশরা নিয়ে তার আত্মপ্রকাশেও প্রস্তুত! দিনটা বেছে নিয়েছি অক্টোবরের ছ' তারিখ। যেদিন মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস, আবার মহালয়াও!

boseprasanta@hotmail.com
arnab_jour@yahoo.com.in

প্রকাশিত হল সায়েন্টিফিকা কম্যুনিকা

মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়: গত ১৫ই আগস্ট সকাল এগারোটায় ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের বা ইসনার একটি অন লাইন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তাদের আন্তর্জালিক ইংরেজি পত্রিকা। যার নাম সায়েন্টিফিকা কম্যুনিকা। এটি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের বর্তমান ও প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের সম্মিলিত প্রয়াস। তবে শুধু ছাত্ররাই নন, এর সঙ্গে জুড়ে আছে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন- এর সংগঠনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ-এর ভাবনাও। এই অনুষ্ঠানের সূত্রে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য আরেকটি আন্তর্জালিক পত্রিকার কথা। যার নাম বিজ্ঞান কহন। এটিরও সম্পাদনার সাথে যুক্ত আছেন প্রাক্তনীরাই। এটি আগামী উৎসবের মরশুমে প্রকাশিত হবার সম্ভবনার কথা বলা হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনাপর্বে উপস্থিত ছিলেন পথিক গুহ। যিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পাঠক-কে আলোড়িত করে চলেছেন বিরামহীন ভাবেই। তিনি স্বাগত ভাষণ দেন। এক্ষেত্রে তার আলোচনায় উঠে এসেছিল বিজ্ঞান জ্ঞাপনের সাথে সমাজের যোগাযোগের সূত্রটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন পথিক গুহ। এই আন্তর্জালিক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ছিল ভারত সরকারের বিজ্ঞান প্রসার নামক সংস্থার অংশগ্রহণও। এই সূত্রে অনলাইন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের আধিকারিকরাও।

অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী ইসনার পক্ষ থেকে বলেন এই সংগঠনের সাথে সমাজের যোগাযোগের কথা। তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সম্পাদক হিসেবে আলোকপাত করেন। এই সংগঠনের সঙ্গে জুড়ে থাকা ইতিহাসের বিষয়ে এবং এই সংগঠনের যে সামাজিক দায়-বদ্ধতার জায়গা দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে তার কথাও তিনি বলেন, যার শুরু উপনিবেশিক কাল থেকেই।

বিজ্ঞান প্রসারে তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর নকুল পরাশর। তিনি বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং এর সঙ্গে বিজ্ঞান প্রসার এর যুক্ত হয়ে যাওয়াকে যথেষ্ট

>>৭

"ওয়েলকাম বায়ো-ফার্মিং"

প্রশান্ত কুমার বসু: সাক্ষাৎকার, তাও আবার সহপাঠীর? এও কি সম্ভব? অগ্রজরা বলেন সম্ভব, কারণ সবটাই সংবাদের প্রয়োজনে। কিন্তু ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য্যের পরিচয়টা করাব কিভাবে? ভারতবর্ষে প্রথম সারির একজন কৃষি বিজ্ঞানী এবং জৈব/জীবাণু সার ও অর্গানিক ফার্মিংএর অন্যতম প্রবক্তা পরিতোষের বায়োডাটা এত বিস্তৃত যে সেটুকু লিখতে গেলেই আমার জায়গা ফুরিয়ে যাবে। অন্য কথা আর লেখা হবে না।

অভিজ্ঞতা প্রচুর। ঘুরেছেও প্রচুর। পুরস্কারও জুটেছে। একই সঙ্গে লেখালেখি, অধ্যাপনাও চালিয়ে গিয়েছে। আবার মেল-

বোর্নে অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত টেস্ট ম্যাচের ধারাবিবরনীও দিয়েছে, যদিও সেটা বেসরকারি ভাবে। ওর জীবন যুদ্ধের শুরু সুন্দরবনের এক প্রান্তিক অঞ্চলে স্কুল শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। তারপর গন্তব্য মুর্শিদাবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের অন্তর্গত ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণাগারে সহ-অধিকর্তা হিসেবে। তারপরে অনেকগুলো বছর নাগপুর, গাজিয়াবাদ, দিল্লি এবং আরও অনেক জায়গা কাটিয়ে অবসর গ্রহণ কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অ্যাডিশনাল কমিশনার হয়ে। এর মধ্যে দায়িত্ব সামলিয়েছে ন্যাশনাল বায়োফার্টিলাইজার ডেভলপমেন্ট সেন্টারের শেষ অধিকর্তা এবং ন্যাশনাল সেন্টার ফর অর্গানিক ফার্মিংএর প্রথম অধিকর্তা হিসেবে। মাঝে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের অধীনে চলা জৈব কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্পের জাতীয় কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব ও সামলাতে হয়েছিল। তাও থামেনি অবসরের পরও। আবার কাজ শুরু নয়ডায় অ্যামিটি ইউনিভার্সিটিতে জৈব কৃষি গবেষণায়।

স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠবে ওর এই ব্যাপক কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যটি কি? ওর সোজাসাপ্টা জবাব জৈব/জীবাণুসার

>>৭

বিজ্ঞান সাংবাদিকতার কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতার ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশান ও ভারত সরকারের বিজ্ঞান প্রসারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল "বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাংবাদিকতা" নিয়ে একটি কর্মশালা।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সপ্তাহব্যাপী এই কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয় গত ২৬শে সেপ্টেম্বর। শেষ হয় ৩ রা অক্টোবর। ২৭ জন অংশগ্রহণকারী এবং প্রায় ৩০

জন প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক পথিক গুহ। তিনি বলেন, বিজ্ঞান সাংবাদিকতার প্রয়োজন শুধু অর্থ উপার্জন নয়, সমাজের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেও এর গুরুত্ব রয়েছে।

সম্মাননীয় অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখলেন বিজ্ঞান প্রসারের বিজ্ঞানী সৌরভ সেন। সরকারি উদ্যোগে বিজ্ঞান প্রচার এর বেশ কিছু প্রকল্প এবং তার ব্যবহারিক পরিসর তুলে ধরলেন তিনি। নবকল্লোল ও শুকতারা পত্রিকার সম্পাদক রুপা মজুমদার প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, সমাজে কিভাবে প্রতিটি মানুষের জন্য বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য ভাবে মাতৃভাষায় পৌঁছে দেওয়া যায়। তিনি আরো বলেন, শিশুদের পাঠোপযোগী সহজবোধ্য বিজ্ঞান রচনার বিশেষ প্রয়োজন।

সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সুনীল তলাপাত্র বলেন, সমাজ থেকে কুসংস্কারকে দূর করতে বিজ্ঞান প্রচার এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া ও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্থার দুই সম্পাদক ড. মানস চক্রবর্তী এবং ড. অমিতকৃষ্ণ দে এবং কর্মশালার আহ্বায়ক ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সপ্তাহব্যাপী এই কর্মশালায় মুদ্রণ মাধ্যমে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ড. রিন্টু নাথ ও রাতুল দত্ত। সভাপতিত্ব করেন ড.সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

>>৭

মাইক্রোচিপ: আমরা কোথায়?

মানসপ্রতিম দাস: স্বাধীনতা আর স্বনির্ভরতা সমার্থক। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যেমন বুঝতেন সে কথা তেমনই জানতেন সেই অশান্ত সময়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা। তাই তো প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বারবার জোর দিয়েছেন স্বদেশে নির্মিত সামগ্রী ব্যবহারের উপর। এ কথা সত্যি যে আজকের বাণিজ্য শাসিত দুনিয়ায় সব বিষয়ে স্বনির্ভর হওয়ার ছাড়পত্র নেই। নিজের বাণিজ্যকে অটুট রাখতে গেলে অন্যের বাণিজ্যকেও জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, খুলতে হয় আমদানির দরজা। কিন্তু এসব মেনে নিয়েও বলতে হয় যে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে পরনির্ভরতা দুর্বল করে ফেলে বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে। কম্পিউটার, সেলফোন থেকে শুরু করে নানাবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহৃত মাইক্রোচিপ এমনই একটা ক্ষেত্র।

প্রত্যেক দেশেরই অর্থনীতির বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা লক্ষ্যমাত্রা থাকে। ভারতের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে জিডিপি-কে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া। একইসঙ্গে ডিজিটাল অর্থনীতির আয়তন বেড়ে হবে এক লক্ষ কোটি ডলার। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এমন একটা বিস্তারে পৌঁছতে গেলে দরকার পড়বে আরও লক্ষ-লক্ষ ইলেকট্রনিক যন্ত্রের। সেই সব যন্ত্রের প্রত্যেকটার মধ্যে থাকবে প্রাণভোমরা মাইক্রোচিপ যা আমদানি করতে হবে ভারতকে।

হয়ত এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে আমাদের দেশ এ ব্যাপারে স্বনির্ভরতা গড়ে তুলল না কেন? সামান্য হলেও ইতিহাসের চর্চার দরকার এখানে। এটা ভাবা ভুল হবে যে ভারত কোনোদিন কোনো পদক্ষেপ নেয় নি এই লক্ষ্যে। ষাটের দশকে ভারতের বিভিন্ন আই আই টি মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছিল। দক্ষতার ছাপ রেখেছিল ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াও। কিন্তু সত্তরের দশকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকে ভারত। আমেরিকাতে নানা কোম্পানি প্রচুর বিনিয়োগ আর মেধার সমন্বয়ে এগিয়ে যায় চিপের নকশা তৈরি ও উৎপাদনের কাজে। আশির দশকে পাল্লা দিতে শুরু করে জাপান। নব্বইয়ের দশকে পূর্ব এশিয়ায় তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর দক্ষিণ কোরিয়াতেও গড়ে ওঠে চিপ বানানোর কারখানা।

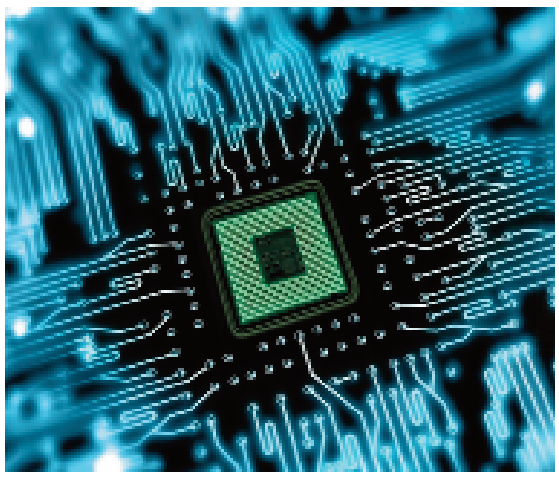

এরই মধ্যে ১৯৮৪ সালে সরকারি উদ্যোগে চণ্ডীগড়ে তৈরি হয় সেমিকণ্ডাক্টর কমপ্লেক্স লিমিটেড। মাত্র পাঁচ বছর পরে এই কারখানায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় যার সম্পর্কে একটা বিশেষণই শোনা গিয়েছে বারবার - রহস্যময়। ভুলে গেলে চলবে না যে এই সেমিকণ্ডাক্টর কমপ্লেক্স ভারতের সামরিক বাহিনীতে ব্যবহারের জন্য চিপ উৎপাদন করছিল। ফলে ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে যাঁরা 'রহস্যময়' কথাটা ব্যবহার করেছেন তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে না। ২০০৫ সালের নভেম্বরে মহাকাশ দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই কমপ্লেক্সকে। ভারতের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ যেমন ব্যবহার করেছে এখানকার তৈরি চিপ তেমনি সামরিক বাহিনীর গবেষণা বিভাগও তা কাজে লাগিয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী। কিন্তু তা দিয়ে তো আমাদের দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন মিটবে না।

চিপ নির্মাণের একটা কেন্দ্র তৈরি করতে প্রচুর খরচা পড়ে। সরকারি বরাদ্দ এবং বড় কোম্পানির অংশগ্রহণ ছাড়া সাফল্যের মুখ দেখা সম্ভব নয়। তবু ইতিউতি চেষ্টা যে হয় নি তা নয়। ২০০৭ সালে এক উদার সেমিকণ্ডাক্টর নীতি ঘোষণা করে কেন্দ্র সরকার এগোল চিপ উৎপাদনের লক্ষ্যে। কিন্তু কাঙ্খিত ফল এল না। বেসরকারি উদ্যোগও সাফল্যের মুখ দেখেনি।

তবে একটা মাত্র আশার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছিল ১৯৯০এর দশকে। চিপের নকশা এবং উৎপাদন ভিন্ন জায়গায় করা সম্ভব হল। দেশের বিরাট সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ারদের মেধা সম্পদ সম্বল করে নকশার কাজটা করতে লাগল ভারতবর্ষ। আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানিরা এই কাজ করার জন্য বেঙ্গালুরু বা হায়দ্রাবাদে ঘাঁটি গড়লেও উৎপাদনের আগ্রহ দেখাল না। ফলে এদেশের মাটিতে তাক লাগানো নকশার কাজ হলেও বাজারে এল না ভারতে তৈরি কোনও চিপ। আমাদের কিছু আই আই টি শক্তি, অজিত ইত্যাদি নামে চিপ ডিজাইন করলেও উৎপাদন ব্যবস্থার অভাবে সেগুলোও আসতে পারে নি বাজারে। ফিরে আসি অর্থনীতির প্রসঙ্গে। আমাদের দেশের আমদানির অঙ্কে জ্বালানি তেলের পরেই রয়েছে ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য। এই নির্ভরতা কমাতে এক গুচ্ছ নীতি ঘোষিত হয়েছে কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে। এর মধ্যে অন্যতম হল ২০১৯ সালের জাতীয় ইলেকট্রনিক্স নীতি এবং মেক-ইন-ইণ্ডিয়া প্রোগ্রাম। বিশ্বমারী এসে উচ্চাকাঙ্খার ছক ঘেঁটে দিয়েছে ঠিকই তবুও আশায় বুক বেঁধে এগোতেই হবে। এর কারণ অর্থনীতি ছাড়াও এখানে জড়িত থাকছে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন।

২০২১ সালে এপ্রিলের শেষে মার্কিন সেনেটের প্রকাশিত সমীক্ষায় মাইক্রোচিপ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়েছে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে। ১৯৯০ সালে সেমিকণ্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে আমেরিকার ভাগ ছিল ৩৭ শতাংশ আর চীনের শূন্য। ২০২০ সালে সেটা ভীষণভাবে পাল্টে গিয়ে হয়েছে যথাক্রমে ১২ এবং ১৩ শতাংশ। ২০৩০ সালে চীনের ভাগ ২৪ শতাংশে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং সে দেশই থাকবে উৎপাদনের শীর্ষে। এভাবেই হয়ত চলতে পারত কিন্তু আমেরিকার 'ন্যাশনাল সিকিউ-রিটি কমিশন অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বলেছে, দেশের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী যদি দীর্ঘমেয়াদে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে এভাবে এগিয়ে যায় বা হঠাৎ করে এক দিন আধুনিকতম চিপের সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তাহলে তারা যুদ্ধবিগ্রহের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে! এরই সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ব্লুমবার্গ নিউজ পোর্টালের প্রতিবেদন। সেখানে জানানো হয়েছে যে গত এক দশক ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার 'সুপার মাইক্রো কম্পিউটার ইনকরপোরেটেড' নামে সংস্থার বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে চীন গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীর উপরে। চাপানউতোর, অস্বীকারের পালার মধ্যে থেকেও উঠে আসছে চিপ নিয়ে নিরাপত্তাহীনতার এক গম্ভীর কাহিনী।

ঠিক এইখানে ভারতেরও উদ্বিগ্ন হওয়ার জায়গা রয়েছে। অর্থনীতি, নিরাপত্তা, শিল্প আজকের দুনিয়ায় এ সব বিচ্ছিন্ন কোনও বিষয় নয়। ফলে স্বাধীনতা বজায় রাখতে গেলে এইসব ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে স্বনির্ভরতা অর্জন করা প্রয়োজন। মাইক্রোচিপ তৈরিতে স্বনির্ভর হওয়া তাই এখন অতি আবশ্যক।

প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ
অল ইন্ডিয়া রেডিও,
কলকাতা
chakmanas09@gmail.com

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

১. অনিতা: না কোন সুন্দরী মেয়ে নয়, নাসার প্রস্তুত করা একটি রেডিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র অনিতা (এ.এন.আই.টি.এ.): আল্টার্কটিক ইমপালসিভ ট্রান্সিয়েন্ট এ্যান্টেনা। এটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভরকণা গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। সম্প্রতি দেখা গেছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে একপ্রকার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভরকণা (নিউট্রিনো) মহাশূন্যের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। সচরাচর এই রকম গতিবিধি মহাশূন্যের থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রগামী হয়ে থাকে।

২. স্টারডাস্ট ১.০: পৃথিবীর প্রথম জৈব জ্বালানি ব্যবহৃত মহাকাশযান। আমেরিকার মেইন শহরের লরিং বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে ২০২১সালের ৩১শে জানুয়ারি এই যান টিকে মহাকাশের উদ্দেশ্যে উৎক্ষেপণ করা হয়।

৩. পেঙ্গুইনোন: এটি একটি জৈব রাসায়নিক যৌগ (C10 H14 O)। মজার বিষয় হলো, এই যৌগটির নামকরণ (পেঙ্গুইনের নাম থেকে করা হয়েছে কারণ এই যৌগটির আণবিক গঠন পেঙ্গুইনের মতো।

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

তথ্য ভার নিয়ে দু চার কথা

দেবপ্রসন্ন সিংহ: তথ্য তত্ত্বের ভারে, তার বাড়বাড়ন্তে আমরা এখন যথেষ্ট চিন্তান্বিত, কোণঠাসাও। আমরা তাকে বইতে গিয়ে, ধরে রাখতে গিয়ে আরও বড়ো বড়ো তথ্য-আধারের অন্বেষণে। নিয়ত নিরন্তর। হায়, পুঁথি লিপি কাগজকলম, তোমার দিন গিয়াছে। সামাজিক হাল হকিকত মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পাতা বেশি শোভা পাচ্ছে, বোধকরি শোভনীয় হচ্ছে অসীম শব্দরাজি, ছবি, গানে কথায়। তথ্যের বাঁধনহারা সূত্রসংবাদে, তত্ত্বের নব নব ব্যাখ্যায় বা উত্থাপনে, কখনো বা প্রচলিত তথ্যের কাঠামো অনুশীলনে,

চর্চায়, শতসহস্র দিক বিকশিত করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার ব্রত নিয়ে, এমন কি আকাশবাতাস ঘিরে মেঘ কুয়াশাচ্ছন্ন করে নতুন তথ্য আধারের কাঠামো নির্মাণে আরও বৃহত্তর প্রচেষ্টায়। প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তথ্যের ; যা পরবর্তী অবস্থায় একটি শব্দ হয় মুকুলিত নয় বিস্ফোরিত হয়ে লক্ষ লক্ষ তথ্য অণু পরমাণু হয়ে শতধা হয়ে খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। প্রতি মুহূর্তে । তা কি শুধু মানুষ তৈরি ? তা কি শুধু অন্য প্রাণী ? মানুষ যে বুদ্ধির ভেদাভেদে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, এও লক্ষ্যণীয়। কৃত্রিম বুদ্ধিধারী, রোবটও তার স্তর-কর্ম ভেদে, মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, সাথে আরও তথ্যের প্রয়োজনে, শরীরের আনাচেকানাচে খুঁটিনাটি যন্ত্রাংশের কামড়ে, তার তরঙ্গবাহিত ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগে তথ্য ছবিসহ ব্যবহারে আছড়ে পড়ছে, তথ্যের আরও নব নব বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, প্রক্রিয়ায়, এই জগত ও বহির্জগত সাবেকি ব্যবস্থার আধুনিকতায়, কখনো বা মহাকাশে মহাসমুদ্রে বৈজ্ঞানিক তীব্র অন্বেষণে।

আমরা এই তথ্যের ভার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিয়ে যাচ্ছি আধার সাজিয়ে সংহত করে। পারছি কি তুলে আনতে, ছেঁকে আনতে, সেই তথ্য-খনি, যা দৈনন্দিন জীবনশৈলীতে উত্তরণে এসে যাবে, আবার অন্যের , দেশের, দশের আরও বড়ো কাজে ? বিজ্ঞান বলে, প্রযুক্তির সাহায্যই নিয়ে, আজ এগোতে হবে এই তথ্য তত্ত্বের চিরন্তন ব্যবহারে গবেষণায়, ছোট করে, বড়ো করে, প্রয়োগ বুঝে, স্বল্পমেয়াদী , দীর্ঘমেয়াদী বিবিধ কর্মযজ্ঞে । বিট বাইটের বড়ো বড়ো মাপ কোটি কোটি বাইটে এসে গিগা এক্সা বাইটে কথা, ছবি, অডিও, ভিডিও ভিন্ন ভিন্ন মালটিমিডিয়া এসে বিশাল তথ্য ব্রহ্মজগৎ তৈরি করছে। আমরা কখনো এই নব প্রজন্মের কাছে রেখে যাওয়া ভিন্ন কারণে তথ্যভাণ্ডারে উল্লসিত, কখনো বা আশঙ্কিত। এই তথ্যরাজির খুঁজে নেওয়া, ছেঁকে নেওয়া সমস্ত উপকরণ নিয়ে শামাল দেওয়ায়, আসছে নতুন নতুন বিষয় , সংজ্ঞা প্রকরণ নিয়ে, আরও নিজেদের উন্নীত করায়, নিজেদের যথেষ্ট বদলে নেওয়ায়। সেটুকুই সারমর্ম করে অনেক জায়গায় আজ এগোতে থাকি বোধহয় আর এক সত্যে, যেখানে অপেক্ষা করছে আরও প্রকল্প ও পরিকল্পনা যা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত ও রূপায়িত হবে।

ফেলো, কম্পিউটার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া
devaprasannasinha@rediffmail.com

মাদাম কুরি: এক অনন্য জীবন

রাজ্যেশ্বর সাহা: মাদাম কুরির জীবন ছিল কঠিন লড়াই ও সংগ্রামময়। তাই তাঁর শিক্ষাজীবন কর্মজীবন, সমাজের বহু ক্ষেত্রে এই প্রতিভাময়ী বিজ্ঞানী অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। দায়িত্ববোধের সাথে অসাধারণ ভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে জীবনের সমস্ত রকমের বিরোধিতাকে মোকাবিলা করেছিলেন।

সালটা ছিল ১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর। পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে এক মধ্যবর্তী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মেরি সক্লোদোভস্কার। পরে তিনি হয়েছিলেন মাদাম কুরি। মাদামের যখন বয়স ছিল ১১ বছর, তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল, কিন্তু তা সত্বেও তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাননি, ফলে তাঁকে পোলিশ এর ফ্লোটিং ইউ-নিভার্সিটি তে ভর্তি হতে হয়েছিল। তারপর তিনি গৃহশিক্ষকতা করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, ১৮৯১ সালে প্যারিসের সর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং গণিত

নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন, এই সময় তাঁর এমন অবস্থা ছিল যে প্যারিসের ওই হাড় হিম করা ঠান্ডার মধ্যে থাকতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। ঠান্ডায় ঘর গরম করার মতো জ্বালানি কেনার অর্থ তাঁর ছিলনা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অপ্রথাগত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করার ফলে ভৌতবিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞান অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় তিনি পিছিয়ে পরেছিলেন। তখন তিনি আরও কঠোর পরিশ্রম করে ১৮৯৩ সালে পদার্থবিদ্যায় প্রথম এবং তার পরের বছরই গণিত পরীক্ষায় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ছিলেন। এইসময় তাঁর দৃঢ় অধ্যাবসা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু ফরাসি বিজ্ঞানীর সহযোগিতায় 'সোসাইটি ফর দি এনকারেজমেন্ট অফ্ ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিস' এ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারপর ১৮৯৪ সালে পদার্থবিদ্ পিয়ের কুরির সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। ১৮৯৫ সালে পদার্থবিদ পিয়ের কুরির সাথে মাদাম কুরি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে প্যারিসের বিজ্ঞানী বেকরেল আবিষ্কৃত রশ্মি সম্পর্কে মাদাম কুরি গবেষণা শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি গবেষণা থেকে লক্ষ্য করেছিলেন ইউরেনিয়াম ছাড়া অন্য আরও একটি পদার্থ থোরিয়াম যৌগ থেকে ও নির্গত হচ্ছে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি পদার্থের এই বিশেষ ধর্ম কে চিহ্নিত করেছিলেন, 'তেজস্ক্রিয়তা'।

থোরিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কৃত হওয়ার পরে কুরি দম্পতি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধাকার 'পিচব্লেন্ড' নিয়ে গবেষণা শুরু করার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে এই খনিজের মধ্যে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ছাড়াও বেশ কয়েকটি অধিক তীব্রতা বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ উপস্থিত আছে। তারপর, ১৮৯৮ সালে মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরি পোলোনিয়াম নামে নতুন একটি পদার্থ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন, এখানেই থেমে থাকেননি ঐ বছরই ২৬ ডিসেম্বর তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন 'রেডিয়াম'।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার নিয়ে মাদাম কুরি সর্বদা মগ্ন থাকতেন ফলে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে দেহের ওজন প্রায় ২০ পাউন্ড কমে গিয়েছিল। ১৯০৩ সালে আবার ডিসেম্বর মাসেই তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা গবেষণার জন্য। এইসময় পিয়েরকুরির মূল লক্ষ্য ছিল অতি মূল্যবান 'রেডিয়াম' ধাতুকে নিষ্কাশন করার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করা, কারণ তখন ১০টন পিচব্লেন্ড থেকে মাত্র ১ মিলিগ্রাম 'রেডিয়াম' ধাতু নিষ্কাশন করা যেত। তাই তাঁরা সেই পদ্ধতি উদ্ভাবনের সচেষ্ট হন। তারপর হঠাৎ, ১৯০৫ সালের ১৯ এপ্রিলে পথদুর্ঘটনায় পিয়ের কুরির মৃত্যু ঘটে যায়। সমস্ত গবেষণা থমকে যায় । তখন মাদাম কুরি সার্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছিলেন, তারপর পিয়েরকুরির সমস্থ অসমাপ্ত গবেষণামূলক কাজ, লেকচার কোর্সগুলি শেষ করার জন্য সমস্থ দায়িত্ব এসে পড়ে মাদাম কুরির উপর, তাই ১৯০৮ সালে সার্বোন বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ সময় অধ্যাপক পদে উন্নিত হয়েছিলেন।

তারপর তিনি 'রেডিয়াম ক্লোরাইড' যৌগ কে ইলেকট্রোলিসিস করেন। মার্কারি কে ক্যাথোড ব্যবহার করে রেডিয়াম ধাতুকে দ্রবীভূত করানোর পর উর্ধ্বপাতন পদ্ধতিতে রেডিয়াম কে নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করার জন্য মেরি কুরিকে দ্বিতীয়বারে ১৯১১ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি তার জীবন সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন কিভাবে বিনা প্রতিবাদে, দৃঢ়তার সাথে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌঁছানো যায়।

টেকনিক্যাল স্টাফ
বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
rajjyeswarsaha@gmail.com

বিজ্ঞান প্রচারে পটের গান

সীমা মুখোপাধ্যায়: কোভিড পরিস্থিতিতে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার নয়া গ্রামের স্বর্ণচিত্রকর করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে পট দেখিয়ে গান গেয়ে সকলকে সজাগ করেছেন। নয়াগ্রাম বিশ্বের পর্যটকদের কাছে পটুয়া গ্রাম হিসাবে পরিচিত। না পরিস্থিতিটা এমন ছিল না। আগে পটুয়ারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পট দেখিয়ে গান গাইতেন। টাকা-পয়সা চাল-কলা যা মিলত তাই ছিল আয়ের উৎস। নয়ের দশকের পর থেকে পটুয়াদের ভূমিকায় পরিবর্তন আসে। সামাজিক বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি অন্যতম লোকমাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয় পটের গান।

এই জড়ানো পট তৈরি করা হয় পুরানো কাপড়ের ওপর কাগজ আটকে। পটের দুই প্রান্তে লাগানো থাকে সরু লাঠি। পটের কিছুটা অংশ খুলে গান গেয়ে দেখানোর পর সেই অংশটুকু গুটিয়ে পটুয়ারা চলে যান পরবর্তী অংশে। ঠিক যেন সিনেমার রিলের মতন। ধারাবাহিক ভাষ্য অনুযায়ী পরপর ছবি চলে আসে। আগে পট আঁকা হতো বেলের আঠার সঙ্গে প্রাকৃতিক রং মিশিয়ে। এখন চটজলদি পোস্টার কালারই ভরসা।

পটের বিষয়বস্তু বিভিন্ন আঙ্গিকের হয়। আগে ধর্মীয় বা পৌরাণিক বিষয়ের উপরই বেশি পট তৈরি হতো। যেমন সত্যপীরের পট, সীতাহরণ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, সাবিত্রী সত্যবান, কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। এছাড়াও ঐতিহাসিক বা জীবনীমূলক পট রচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আজাদহিন্দ ও নেতাজি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী হানা, হিরোশিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি।

বর্তমানে সামাজিক বিষয়বস্তুর উপর পটের খুব চাহিদা। সরকারি বা বেসরকারি প্রচার অভিযানে পটুয়াদের ডাক পড়ে। পালস পোলিও, এইডস থেকে রক্ষা, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, সার্বিক সাক্ষরতা, বৃক্ষরোপণ, মেয়েদের আইনি অধিকার, কন্যাভ্রূণ হত্যার কুফল, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে পটুয়ারা গান বেঁধে পট তৈরি করেন।

১৯৮৭ সালে ভারত জনবিজ্ঞান জাঠায় বৈজ্ঞানিক মানসিকতা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রথম লোক মাধ্যমগুলিকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানে এলাকা-ভিত্তিক প্রচারের কাজে পটের গান প্রাধান্য পায়। উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে পটের গানকে নানা-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ক, পরিবেশ সংরক্ষণ, পুষ্টি বিষয়ক, জনকল্যাণ শিক্ষা বিষয়ক, কৃষি সংক্রান্ত বিবিধ কর্মসূচীতে পটুয়ারা গান বেঁধে পট তৈরি করে জেলায় জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচীতে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। অনেক সময় পটুয়াদের সঙ্গে দুই তিন দিন ধরে ওয়ার্কশপ করে বিষয়গুলিকে বিষয় বিশেষজ্ঞের সাহায্যে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পটুয়ারা সেই বিষয়ের ওপর নিজের মতন করে গান বেঁধে পট তৈরি করার পর প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়।

বর্তমানে দেশে বিদেশে সর্বত্র পটুয়ারা প্রশংসিত। বইমেলা থেকে শুরু করে নানান ধরনের মেলায় তাদের দেখতে পাওয়া যায়। মিউজিয়ামে পুরোনো পট যত্নসহকারে সংরক্ষিত হয়। ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এই লোকমাধ্যমকে তুলে ধরতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পটুয়াদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিজ্ঞান সংগঠনগুলি বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজে জড়ানো পট ব্যবহারের কথা ভাবতে পারেন।

প্রাক্তন
প্রোগ্রাম কোয়ার্ডিনেটর
এস আর সি, পশ্চিমবঙ্গ
ও
প্রাক্তন সম্পাদক
জীবনকথা
sima.ekdalia@gmail.com

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সাংবাদিকতা

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়: তর্কটা অনেক পুরোনো। বিজ্ঞানীরা কি সাধারণ মানুষের ভাষায় লিখতে পারেন? নাকি তাঁদের বিজ্ঞান-গবেষণা আমজনতার কাছে হাজির করতে দরকার অন্য লোকের? আবার সেই লোকেরা বুঝবেন তো বিজ্ঞানীদের গবেষণা, নাকি লিখে দেবেন 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'?

ভারতে বিজ্ঞানী বলতেই যাঁদের কথা প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে সেই জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু নিজেরা অনেক লিখতেন। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। জগদীশচন্দ্রর বিজ্ঞানসাহিত্যের অপূর্ব নিদর্শন 'অব্যক্ত' (১৯২১)। এই গ্রন্থ মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। তিনি যে, বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য লঘু করেননি তার প্রমাণ হল তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণানিবন্ধকেও তিনি বাংলায়, সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে (১৯১৬) উপস্থাপিত তাঁর গবেষণানিবন্ধই 'অদৃশ্য আলোক' শিরোনামায় 'অব্যক্ত'-এ ঠাঁই পায়। বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশেও যে জগদীশচন্দ্র প্রয়াসী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা থেকে, 'মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাহারই মধ্যে এক শক্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহির্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পারে।'

প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার বিষয় নির্বাচনের মধ্যেও সমাজবদ্ধতার পরিচয় মেলে। ১৮৯০-এর দশকে কলকাতায় যখন ভেজাল সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল তখন প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের প্রায়োগিকচর্চার মাধ্যমে তার মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিলেন। বাজারে বিক্রিত তেল ও দুধের নমুনা সংগ্রহ করে তার মধ্যেকার ভেজাল নিরূপণ করেন তিনি। এই অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশ করেন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। বিজ্ঞানকে সমাজমুখী করার লক্ষ্যে গবেষণা-

নিবন্ধর পাশাপাশি মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় নিবন্ধও লিখেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। বিষয়ের মধ্যে ছিল সরল প্রাণীবিজ্ঞান, খাদ্যবিজ্ঞান, রাসায়নিক পরিভাষা প্রভৃতি। সেই সময়কার বিখ্যাত সাময়িকপত্র প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর বিজ্ঞাননিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে বারবার এসেছে বিজ্ঞানকে সামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার কথা। প্রফুল্লচন্দ্র স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন ভারতে জাতপাত আর কায়িক শ্রমের প্রতি অসম্মান বিজ্ঞানচর্চাকে পিছিয়ে দিয়েছিল। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন এক বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে যিনি বিজ্ঞানকে সমাজমুখী এবং সমাজকে বিজ্ঞানমুখী করতে চেয়েছিলেন।

মেঘনাদ সাহার লেখা বের হয়েছিল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, নব্যভারত, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগবাণী প্রভৃতি সেই সময়কার বিখ্যাত সংবাদ-সাময়িকপত্রে। ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে তিনি এলাহাবাদের শিশু ভারতী পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভৌগোলিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয়ে লেখেন।

এঁরা কেউই বিজ্ঞানকে পরীক্ষাগারে আটকে রাখেন নি। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, বিজ্ঞান সাধনায় নিজেদের মিলিত শক্তি নিয়োগ করতে না পারলে দেশ ও জাতির উন্নতির আশা নেই। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞানীরা তো আর তাঁদের মত সাধারণের জন্য লেখেন না। ফলে বিজ্ঞানজগতের জানলা খোলার দায়িত্ব আজ বিজ্ঞান সাংবাদিকদের। আর সেই বিজ্ঞান সাংবাদিক তৈরির কাজ সাড়ে তিন দশক ধরে করে চলেছে যে সংগঠন সেই 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন'(১৯৩৫)ও তৈরি প্রফুল্লচন্দ্র-মেঘনাদ-এর হাত ধরে।

সায়েন্স অ্যান্ড কালচার-এর
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও
ইসনার কাউন্সিল সদস্য।
ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
sabya4@klyuniv.ac.in
sabya4@gmail.com

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ: একটি ইতিকথা

সুমিত্রা চৌধুরী: অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হলেও পরাধীন ভারতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে একটি চিঠি দেন। পরবর্তীকালে সেই চিঠির ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় মেকলে মিনিটস যাতে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশপ্রেমী মুষ্টিমেয় কয়েকজন উদ্যোগী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির অদম্য চেষ্টায় আমাদের দেশে নতুন করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্যাচর্চা শুরু হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বমানে পৌঁছেছে।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহেন্দ্রলাল সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি. ভি. রমন প্রমুখ এবং এঁদের যোগ্য উত্তরসূরী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিশিরকুমার মিত্র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সহ অনেকে। এই বিজ্ঞানীরা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করে দেশকে সম্মানে পৌঁছে দেবার প্রেরণায় পঠন পাঠন গবেষণা করেছেন আবার দেশের সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এগিয়ে এসেছেন। সাধারণের বিজ্ঞান শিক্ষায় মূল বাধা যে বিদেশি ভাষা মাধ্যম সেটি অনেকেই উপলব্ধি করে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের বই, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। প্রথম বাংলা ভাষায় দিগদর্শন নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। বই ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বাংলায় বিজ্ঞানের লেখায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, রামেন্দ্রসুন্দর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

কিন্তু আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, "যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না তারা হয় বিজ্ঞান বোঝেন না অথবা বাংলা জানেন না।" সত্যেন্দ্রনাথ বসু কোনো নিজস্ব গবেষকমণ্ডলী বা স্কুল গঠনে বিশ্বাস করতেন না। অথচ তিনিই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এ আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের মাত্র সাড়ে চারমাস পরেই ২৫ জানুয়ারি, ১৯৪৮ রামমোহন লাইব্রেরিতে প্রায় চারশো বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্থাপিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ'। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শুধু বিজ্ঞান ব্যক্তিত্ব নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে প্রথম পরিচালন সমিতিগঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিনেই প্রকাশিত হয়েছিল পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা।

>>৭

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিজ্ঞান সংগঠন

সুকল্যাণ গাইন: 'সমাজের জন্য বিজ্ঞান' এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতার পর ভারতে একাধিক বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে ওঠে। সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলা। পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দিকেও একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের সাংগঠনিক প্রয়াস ১৯৪৭-এর পর শুরু হয়েছিল তা নয়। স্বাধীনতার আগেও একাধিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানের নানান গবেষণার মাধ্যমে নব দিকের উন্মোচনে সেইসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও রয়েছে। তবে প্রশ্ন ছিল সাধারণ মানুষ, যারা তথাকথিত ভাবে বিজ্ঞানচর্চা করেন না, তারা আদৌ কী বিজ্ঞানের নানান গবেষণা সম্পর্কে অবগত হতে পারছেন? সবাই যে বিজ্ঞানচর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন তা নয়। অন্যদিকে ভাষাগত সমস্যাও ছিল; ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বোঝা অনেকের পক্ষেই ছিল অসম্ভব। প্রয়োজন ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার।

বঙ্গে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকে। প্রথমে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রয়াস নেওয়া হয়। সাংগঠনিক ভাবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উদ্যোগ নিতে দেখা গেল বিশ শতকে। এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এর। সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার পাশাপাশি মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উদ্যোগও নিয়েছিলেন। প্রথমে ঢাকায় গিয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানীদের নিয়ে ১৯৪১ সালে প্রকাশ করেছিলেন বিজ্ঞান পরিচয় পত্রিকা। যদিও

পত্রিকাটি কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা থেকে ফিরে কলকাতায় এসে ১৯৪৮ সালে গড়ে তুললেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পীঠস্থান বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। এটি ছিল স্বাধীনতার-উত্তর ভারতের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় প্রথম প্রতিষ্ঠান। প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ও পরবর্তীসময়ে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত পরিষদের মুখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকাটি বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটি আজও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠানের পর ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে উঠতে দেখা যায়। পরিষদের মতোই সেইসব সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা। ১৯৫৩ সালে আসামে গড়ে উঠেছিল গুয়াহাটি সায়েন্স সোসাইটি।

>>৭

বাতাস থেকে পানীয় জল

অমিত কৃষ্ণ দে: সারা পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পান করার বিশুদ্ধ জল। সরকার থেকে যে জল সরবরাহ করা হয় তাই একমাত্র পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টিউবওয়েলের জল গ্রামে-গঞ্জে ব্যবহার করা হয় পানীয় জল হিসেবে কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে জলের মান নিয়ে। মাটির নিচে জল ধীরে ধীরে কমে আসার জন্য কলের জল সব সময় পান করা র অনুপযুক্ত। জল পরিষ্কার থাকছে না আবার আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ছে বিশেষ করে যেসব এলাকায় মাটির নিচে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি সেই এলাকায় টিউবওয়েলের জলে আর্সেনিক পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। অন্যদিকে যেসব জায়গায় কুয়ো আছে সেগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে বা জল নোংরা হয়ে পান করার অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কাছে শুদ্ধ জলের চাহিদা খুব বেশি রকমের।

এইসব কারণে বৈজ্ঞানিকরা বিশুদ্ধ জল এর সন্ধান চালিয়ে চলেছেন বহু দিন ধরে। চেষ্টা চলছে কীভাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরি করা যায়। এই চেষ্টায় সার্থক হয়ে আরবদেশের মাসদার শহরে এক বড় রকমের প্লান্ট তৈরি করা হয়েছে যেখানে শুষ্ক বাতাস থেকে শুদ্ধ পানীয় জল ক্রমাগত তৈরি হতে থাকবে। আমেরিকার ওয়াটার টেকনোলজিস কোম্পানি AQUOVUM LLC এই প্রকল্প স্থাপন করেছে খালিফা ইউ-নিভার্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজির সঙ্গে যৌথভাবে। এরা মাসদার শহরের এয়ারপোর্টের কাছে এই প্রকল্প তৈরি করে পুরো এয়ারপোর্টকে পানীয় জল সরবরাহ করবে। যেসব মেশিন বাতাস থেকে জল শুষে নেবে তা চলবে সৌর শক্তির সাহায্যে, সুতরাং এই জন্য বিদ্যুৎ খরচা আলাদা করে হবে না। বাতাস থেকে জল তৈরি করা নতুন কিছু নয়। এই ধরণের মেশিন তৈরি করেছেন বৈজ্ঞা-নিকরা অনেক বছর আগে। সারা পৃথিবী জুড়ে এর ব্যবহারও হয়

চলছে কিন্তু এত বড় প্রকল্প বোধ হয় প্রথম। আগে মনে করা হতো যে বাতাস যদি দূষিত হয় তাহলে যে জল পাওয়া যাবে তাও হয়তো দূষিত হবে। কিন্তু তার জন্য বৈজ্ঞানিকরা খুব সতর্ক ছিলেন। বাতাস থেকে শুষে নেওয়া জলকে কয়েক স্তর পার করিয়ে তবে তারা পরিশোধিত অবস্থায় বের করে আনে। বিভিন্ন স্তর পার হয়ে এই জল পরিশুদ্ধ হয়ে পানের উপযুক্ত হয়। অবশ্য জল তৈরি হওয়ার জন্য দরকার বাতাসে ন্যূনতম ৩০% আদ্রতা। মেশিনে থাকা কন্ডেন্সেশন ইউনিটটি বাতাসের বাষ্প থেকে জল শুষে নেয় এবং তা বিভিন্ন স্তর পার হয়ে শুদ্ধ পানীয় জল হিসেবে পরিণত হয়। যন্ত্রগুলি ১০ থেকে ১০০০০ লিটার পর্যন্ত জল তৈরি করতে পারে প্রতিদিন। অবশ্য সেই জন্য বাতাসে যথেষ্ট পরিমান আদ্রতা থাকা দরকার। আশা করা যায় এইভাবে জল তৈরি করে পানীয় জলের সমস্যা কিছুটা মেটানো যাবে ভবিষ্যতে।

উপদেষ্টা
ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস
অ্যাসোসিয়েশন
(ডিএসটি, গভ. অব ইন্ডিয়া)
ade59247@gmail.com

অ্যান্টার্কটিকায় অণুজীব

মীনাক্ষী দে: অ্যান্টার্কটিকার বরফে ঢাকা লেক হুইললানসের কাছে তাঁবুতে গবেষণাগারে গবেষণা করে দেখা গেল বরফের তলায় যে পাথরের কুচি আছে সেগুলিকে প্রায় ৪০ দিনের বেশি জলে ডুবিয়ে রাখা হল। তারপর সেই জলকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যেমন হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইত্যাদি পাওয়া যায়। এইসব কেমিক্যাল গুলির জন্য দায়ী মিথেনোট্রোফ নামে এক ধরনের অণুজীব যারা বেড়ে ওঠার জন্য নির্ধারিত শক্তি উৎপাদন করতে মিথেন গ্যাস গ্রহণ করে।

এর বিপরীতটি ঘটে মিথেনোজেনসদের ক্ষেত্রে যারা হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে মিথেনে পরিবর্তিত করে শক্তির সৃষ্টি করে। এই লেকে বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে

যারা নাইট্রিফিকেশন পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট কে নাইট্রেটে পরিনত করে নিজেদের শক্তি অর্জন করে। গবেষকেরা দেখেছেন সেই লেকের প্রতিটি কেমিক্যাল ব্যবহার করে কোনো-না-কোনো অণুজীবের দল নিজেদের শক্তির সঞ্চার করেছে। এই তথ্য পৃথিবীর বহিরাগত জীবকে খুঁজে বার করতে গবেষকদের সাহায্য করবে এবং এর থেকেও বোঝা যাবে বরফে ঢাকা গ্রহ চাঁদ গুলিতে কিভাবে অণুজীরা বেঁচে থাকতে পারে।

ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবাইলজি
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বন সংরক্ষণের বিবর্তনের ধারা

অশেষ লাহিড়ী: জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করার জন্য বনভূমির একটা বিশাল ভূমিকা আজ তা সর্বজন বিদিত। কিন্তু বন সংরক্ষণ বিষয় সাধারণ ভাবে মানুষের কাছে কিছুটা হলেও অস্বচ্ছ। তাই কিভাবে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বন সংরক্ষণ শুরু হয়েছিল সেই সমন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে শুরু করে, ক্রমশ ভারতের বনসংরক্ষণ বিবর্তনের ধারা সমন্ধে উল্লেখ করব। মধ্যযুগে ইউরোপের উপকূলবর্তী অঞ্চলের উন্নত অর্থনীতির ভিত্তি ছিল সমুদ্র বাণিজ্য। সেই সময় বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও বানিজ্য জাহাজ পুরো-পুরি কাঠ থেকে তৈরি হতো। একটা হিসাব থেকে জানা যায় একটা বড় জাহাজ তৈরী করতে দুহাজার ওক গাছের প্রয়োজন হতো। এছাড়া বাড়িঘর তৈরি, আসবাবপত্র ইত্যাদিতে প্রচুর কাঠ প্রয়োজন হত। নিজেদের দেশের বন ও মধ্য ইউরোপের দেশ-গুলোতে থেকে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশগুলো অতিরিক্ত পরিমাণ কাঠ অপরিক-ল্পিত ভাবে নেবার ফলে ভীষণ ভাবে কাঠের অভাব দেখা দেয়। তখন উপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও পরিচালনার কথা শুরু হয়। অর্থনীতিবিদ Adams Smith এর Economic theory ও Ricar-dian এর Rent theory বন সংরক্ষণ ও পরিচালনার ব্যাপারে প্রভাবিত করায় মধ্য ইউরোপের দেশগুলোতে প্রাকৃতিক বনের পরিবর্তে অধিক উৎপাদনশীল Norway Spruce লাগানো শুরু করে, অল্পসময়ে বেশী লাভের জন্য। ক্রমশ অনেক দেশ এই ভাবে অধিক উৎপাদনশীল বন সৃষ্টি করে উপযুক্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সহযোগিতায়। জার্মানি কিন্তু প্রাকৃতিক বন থেকে টেকসই বন (sustainable for-est সৃষ্টি করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত সংরক্ষন ও পরিচালনা বাবস্থ , ১৮২০ থেকে শুরু করে সেইমত জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার প্রাকৃতিক বনকে আদর্শ বনে(normal forest) পরিণত করার জন্য উপযুক্ত silvicul-tural system উদ্ভাবন করে যাতে প্রাকৃতিক উপায়ে বনে কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির চারা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি জার্মানিতে ১৭১৩তে HK Von Carlowitz প্রথম Sustainable টেকসই বনের প্রয়োজনের কথা

বলেছিলেন। একটা কথা খুব আশ্চর্য মনে হয়, এখন আমরা sustainable development কথা বলি, কিন্ত সেই যুগে sus-tainable forest এর কথা ভাবা হয়েছিল। এবার ভারতের বন সংরক্ষণের গোড়ার কথা। ব্রিটিশ নৌশক্তি ইউরোপের মধ্যে অন্যতম ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ ভারত জয়ের পর বিপুল সেগুন বন তাদের দখলে আসে, সেগুন জাহাজ তৈরির উপযুক্ত কাঠ হওয়ার ফলে বড়ো বড়ো সেগুন গাছ জাহাজ তৈরি করার কাজে ব্যবহার করায় তাদের নৌশক্তি বৃদ্ধি পায় কিন্তু অপরিক-ল্পিতভাবে উপযুক্ত গাছ কাটার ফলে কাঠের অভাব হতে থাকে। সেইসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে ১৮৫২তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্মার সেগুন অঞ্চল দখল করে, বার্মাকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করে। পূর্ববর্তী কমি-টির রিপর্টের ভিত্তিতে লর্ড ডালহৌসি তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বন সংরক্ষণের জন্য টেকসই বন পরিচালনার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের লেকচারার Dr Brandis কে বার্মার পেগু বনের সেগুন টেকসই ভাবে সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য নিয়োগ করেন। Brandis, ১৮৫৬তে পেগুর সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন ১৮৬২ পর্যন্ত তিনি সেগুনের টেকসই বন সংরক্ষণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রথমেই পূর্বতন অপরিকল্পিত ভাবে বড়ো গাছ কাটার পারমিট প্রথা বন্ধ করেন ও গাছের বৃদ্ধির হার ও বিভিন্ন বয়সের গাছের আনুপাতিক সংখ্যা জেনে, নির্দিষ্ট কিছু বড়ো গাছের মাধ্যমে যা পরিসংখ্যান দ্বারা ঠিক করে, কাটার পারমিট দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতের জোগানের ব্যবস্থা রেখে বর্তমানের। প্রয়োজন মেটানো হবে টেকসই বন পরিচালনার মূল মন্ত্র, সেইমত পরিচালনা ব্যাবস্থা শুরু করেন। যদিও এই প্রথা চালু করতে প্রভূত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত পেগু বনে সেখানকার কারেন উপজাতি সেগুনের বনাঞ্চলে shifting cultivation করতো যাকে ওরা বলতো Taungya, এরফলে বন ধ্বংস হত। Brandis স্থানীয় বন কর্মচারীর দ্বারা কারেন উপ-জাতিকে অনুপ্রাণিত করে তাদের ফসলের সাথী ফসল হিসেবে সেগুন গাছের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করেন এবং এই সিস্টেমের নাম দেন Taungya system. এর ফলে সহজেই বিনা খরচে সেগুন বন সৃষ্টি হতে থাকে। এই ভাবে সেগুন বন সংরক্ষণ ও পরিচালনার কাজ শুরু করে সফল হন ফলে বার্মার সেগুন বন রক্ষা পায়। বার্মাতে সফল বন পরিচালনার পর ১৮৬৪ তে ব্রিটিশ পার্লমেন্টে ভারতে বন সংরক্ষণ করার জন্য বনবিভাগ সৃষ্টির অনুমোদন দেয়। এবং Brandis কে প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল হিসেবে ভারতে বন বিভাগ সংঘটন করার জন্য মনোনীত করেন।

প্রাক্তন
চিফ কনসারভেটর
অব ফরেস্ট
পশ্চিমবঙ্গ
ও কনসালটেন্ট,
এফএও

অচেনা অরণ্যদেবের খোঁজে

সন্দীপন চ্যাটার্জি: রবিবারের খবরের পাতায় অরণ্যদেবের গল্প আমাদের সকলের ছোটবেলার সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তের দিনগুলিকে সব সময় উজ্জ্বল করে তোলে। কিন্তু ভারতের বুকে আরো একজন রোমাঞ্চকর অরণ্যদেবের কীর্তি আমাদের সকলকে অবাক করে। আমরা এই অরণ্যদেবের খোঁজ পাই হিমালয়ের পার্বত্য উপত্যকার বনভূমির মধ্যে। ভারতের এই অরণ্যদেব হল বহু গুণে গুণান্বিত সুন্দরলাল বহুগুণা, যার জন্ম হয়েছিল ১৯২৭ সালের ৯ ই জানুয়ারী। পাহাড়ের কোলে বেড়ে ওঠা এই অপরিচিত বঙ্গসন্তান, অন্য পদবীর আড়ালে দেশের পরাধীনতা মোচনে অহিংস অসহযোগ সংগ্রামে অংশগ্রহনের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে অস্পৃশ্যতার অভিশাপকে দূর করে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নির্মল পরিবেশে পাহাড়ি মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালোবাসার ভূস্বর্গ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। তার এই আনন্দ আশ্রমের কর্মকাণ্ডে হাত বাড়িয়ে দেন তাঁর সহধর্মিণী বিমলা দেবী। এই বহুগুণা দম্পতি , পার্বত্য অঞ্চলের সরল মানুষের মধ্যে স্নেহ ভালোবাসার বিনিময়ের সাথে সাথে, তাঁরা পাহাড়ি মানুষের মধ্যে মাদক বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন, যাতে করে গ্রামীণ জীবন যাত্রা নেশার কবল থেকে মুক্তি পায়। সুন্দরলাল বহুগুণার পরিবেশ আন্দোলনের ধারা সর্বোত্তম রূপ পায় সত্তরের দশকে। অবাধে গাছ কাটার ফলে পাহাড়ে বনভূমির পরিধি ক্রমশ কমতে থাকে, এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সামগ্রিক পরিবেশ ও জনজীবন এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতার পূর্বে বনের কাঠ নিয়ে ইংরেজ সরকার এক লাভজনক ব্যবসায় নেমেছিল। স্বাধীনতার পরেও কিছু ব্যবসাদার কোম্পানি মুনাফার লোভে এই কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য বনভূমি গাছ কেটে সেগুলি খোলাবাজারে বিক্রি করা। এই অবাধে গাছ কাটার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করাতে তাদের উপর নেমে এসে-ছিল অসম্ভব অত্যা-চার।

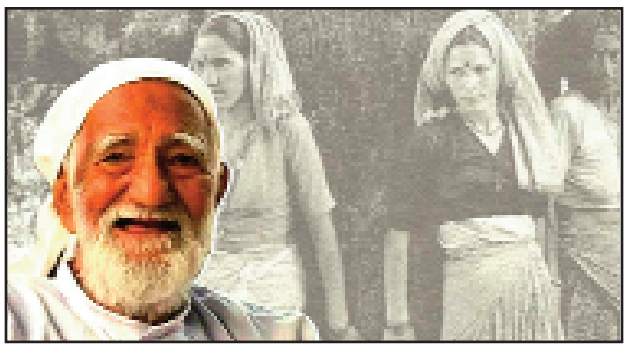

এমনই এক দিনে কোম্পানির লোকেরা যখন গাছ কাটতে আসে তখনই চামোলি গ্রামের বীরাঙ্গনা গৌরী দেবী তার প্রতিবাদ করে, তার এক ডাকে গ্রামীণ মহিলারা জড়ো হয়ে 'চিপ কো পেড়' ধ্বনিতে সন্তানসম গাছকে মাতৃস্নেহে জড়িয়ে ধরে; বদলে মেলে অকথ্য অত্যাচার। সুন্দরলাল এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলজুড়ে এই বার্তা ছড়িয়ে দেন, কোনো ভাবেই বনভূমি ধ্বংস করা যাবে না, বনভূমি থাকলে থাকবে হিমালয় আর থাকবে ভারতের প্রাণ। বনভূমি সংরক্ষণ নিয়ে তাঁর আন্দোলন সমগ্র হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, এই সংগ্রামে আমাদের অরণ্যদেব সুন্দরলাল শুরু করেন পদযাত্রা, কোহিমা থেকে কন্যাকুমারী। সারা ভারতবর্ষ এবং সারা পৃথিবী জানতে পারে তার পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষার লড়াইয়ের কথা।

তাঁর আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয় গাছ কাটার এই নিধন যজ্ঞ, সমগ্র ভার-তের বনভূমি এক স্বরে বলতে থাকে , অবাধে আর গাছ কাটা চলবে না। এক হাজার মিটারের উচ্চতার ওপরে দরকার ছাড়া গাছ কাটা নিষিদ্ধ হয়। আন্দোলনে জয়ী হয় সুন্দরলাল, সমগ্র পাহাড়ি মানুষের ভালোবাসা ও সহযোগিতায় চিপকো আন্দোলন সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হয়। অরণ্যদেব সুন্দরলালের এই সমস্ত কীর্তি সত্যিই আমাদের কে অবাক করে। পরিবেশ আন্দোলনের এই মহামানব, এর পরেও ১৯৭৮ সালে তেহিরি অঞ্চলে জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের যে জলাধার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, প্রকৃত পক্ষে যা গঙ্গার গতিকে রুদ্ধ করে এলাকার জৈব বৈচিত্র্যকে নষ্ট করার এক রূপরেখা ছিল যার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। তৎকালীন সরকার এর এই পরিবেশবিমুখ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে, প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজকে রক্ষার লক্ষ্যে মিতভাষী এই মহামানব অরণ্যের মধ্যে গঙ্গার তীরে শুরু করেন নীরব অনশন আন্দোলন, খবর পৌঁছে যায় সারা দেশে, মানুষের সমর্থন ভালোবাসা ও সচেতনতা সকলকে ভাবতে বাধ্য করে যে অরণ্যকে ধ্বংস করে এক পা এগোনো যাবে না। পরিবেশ আন্দোলনে ও অরণ্যের অধিকার রক্ষায় সুন্দরলাল বহুগুণার বিশ্ব জোড়া কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে পরিচয় দেয় ভারতের। ভারতের এই ভূমিপুত্র অরণ্যদেব কে চলতি বছর ২০২১ সালের, ২১শে মে আমরা হারিয়েছি। কিন্তু তাঁর আন্দোলনের ধারা, তাঁর চিন্তা সকলকে এই কঠিন সময়ে, পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষার আন্দোলনে এক নতুন দিশা এক নতুন প্রেরণা প্রদান করে চলেছে। আগামী দিনেও ভারতের নানা ক্ষেত্রে, নানা কোণে আরও অনেক অরণ্যদেব এর খোঁজ জারী থাকবে, যাঁদের অনেকের অচেনা অজানা কাহিনি আমাদেরকে আরও সাহস জোগাবে বিপর্যয় কে প্রতিহত করে পরিবেশ ও বিজ্ঞান কে রক্ষা করতে।

গবেষণা সহযোগী
পাবলিক হেলথ অ্যানালিটিকস ইউনিট , খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
sandipan.april@gmail.com

ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান কলেজে বিপ্লবী

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়: সালটা ১৯১৫। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন মধ্য গগনে। এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এমএসসির ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে একদল উজ্জ্বল মুখ। মিশ্র গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দ্বিতীয় হয়েছেন মেঘনাদ সাহা। রসায়নবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় হয়েছেন জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় হয়েছেন স্নেহময় দত্ত। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়া মাত্রই এদের একে একে লুফে নিলেন এবং ঘোষ পালিত প্রভৃতি ট্রাস্ট ফান্ড থেকে গবেষণা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন বিজ্ঞান কলেজ এর রূপকার এবং প্রতিভা সন্ধানী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। উদ্দেশ্য একটাই। যাতে তারা অদূর ভবিষ্যতে গবেষণামূলক শিক্ষা-দানের জন্য নিজেদের তৈরি করে নিতে পারেন। আজ আমরা যার কথা বলব তিনি হলেন শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্থানাধিকারী। গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল - "সাম প্রপার্টিজ অফ আয়রন ডিপোজিটেড ইলেকট্রিক্যালই ইন এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড।"এম এস সি পরীক্ষার এই গবেষণাপত্রটি আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্র দরদী আশুতোষ শৈলেন্দ্রনাথের জীবনের কর্মপন্থা ও স্থির করে দেন। তারকনাথ পালিত ফান্ড থেকে গবেষণামূলক বৃত্তি পেয়ে শৈলেন্দ্রনাথ নিবিষ্টমনে গবেষণা-কর্মে নিযুক্ত হলেন এবং সেইসঙ্গে বিজ্ঞান কলেজ সংগঠন সম্পর্কিত কাজকর্মে আশুতোষের সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। গবেষক রূপে পাঁচ-ছয় মাস কাজ করার পর আশুতোষ এর নির্দেশে শৈলেন্দ্রনাথ উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কাজে আমেরিকা যাবার জন্য স্কলারশিপ প্রার্থী হলেন। যথাসময়ে শৈলেন্দ্রনাথ এর আমেরিকা যাবার পাসপোর্ট মঞ্জুর হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা করতে তিনিই প্রথম নির্বাচিত হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। শৈলেন্দ্র-নাথের জীবনেও তাই ঘটল। বিদেশযাত্রার তিনদিন আগে পুলিশ তার আমেরিকা যাওয়ার পাসপোর্ট প্রত্যাহার করে নিল।

আশুতোষ-এর নির্দেশে শৈলেন্দ্রনাথ আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পরিবর্তে ইংল্যান্ড- এর রয়েল কলেজ অব সায়েন্সে পড়াশোনার জন্য স্কলারশিপ মঞ্জুর করতেও পাসপোর্ট পেতে সাহায্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে জল আরো ঘোলা হতে শুরু করেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই পুলিশ শৈলেন্দ্রনাথ এর পরিতক্ত বাসায় তল্লাশি চালায়। সেখানে তাকে না পেয়ে বিজ্ঞান কলেজে তার গবেষণা কক্ষে খানাতল্লাশি করে। পুলিশ তাকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে। উপায় না দেখে শৈলেন্দ্রনাথ আশুতোষ এর কাছে পরামর্শের জন্য এলেন। শৈলেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় হিন্দু হোস্টেলে যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন তা আশুতোষের অজানা ছিল না। আমেরিকায় হিন্দু জার্মান ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং বুড়িবালামের তীরে বাঘাযতীন ও তার সঙ্গীদের ব্যর্থ সংঘর্ষের পর বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার স্বপ্ন কিছুটা থমকে যায়। ফলে শৈলেন্দ্রনাথ সেই সময়

বৈপ্লবিক কাজকর্মে ইতি টেনে শিক্ষা ও গবেষণায় নিজেকে সমর্পণ এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই প্রতিভাবান ছাত্রটির পাশে দাঁড়ালেন আশুতোষ। তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে পুলিশের নজর এড়াতে কিছুদিনের জন্য তিনি গা-ঢাকা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন শৈলেন্দ্রনাথ কে। বিশ্ববিদ্যালয় যে শৈলেন্দ্রনাথ এর গতিবিধি সম্পর্কে একেবারেই কিছু জানে না, পুলিশের কাছে এরকম একটা হাবভাব করলেন আশুতোষ। কয়েক মাস আত্মগোপন করে থাকার পর শৈলেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরলেন। এদিকে পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তাকে ধরিয়ে দেবার পুরস্কার ২৫ হাজার টাকা। এবার আশুতোষ তাকে দেশ ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। ভেবেছিলেন তিব্বতের পথে চিনে পাড়ি দেবেন, সফল হলো না। তখন ভাবলেন বর্মার পথে যাবেন,হলো না। জলপথে যাবেন ভাবলেন। আশুতোষ এভাবে যেতে বারণ করলেন। ছদ্মবেশ ধারণের পরামর্শ দিলেন। খালাসির ছদ্মবেশে শৈলেন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারত ত্যাগ করে পৌছলেন আমেরিকার ফিলা-ডেলফিয়া শহরে।

শৈলেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর বিজ্ঞান কলেজে ইংরেজদের দৃষ্টি আরো বেশি করে পড়লো। ইংরেজরা বিজ্ঞান কলেজের বাতাসে বারুদের গন্ধ পেলেন। তারা মনে করলেন এখানে বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি বোমা পিস্ত ল বানানোর কারখানা তৈরি হয়েছে। ভারতীয় উদ্যোগে যে বিজ্ঞানচর্চার শুরু হয়েছিল ইংরেজরা তাতে সাহায্য তো করলেন না বরং বোমা পিস্তল বানানোর অপরাধে বহু প্রতিভাবান বিজ্ঞানের ছাত্র দের গ্রেপ্তার করতে শুরু করলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখার্জী, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, নীলরতন ধর, পু-লিনবিহারী সরকার, প্রিয়দা রঞ্জন রায়, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, দেবেন্দ্রমোহন বসু, সুশীল কুমার আচার্য, শিশির কুমার মিত্র, যোগেশ চন্দ্র মুখার্জী, মনিন্দ্র নাথ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, অবিনাশ চন্দ্র সাহা প্রমুখ ছাত্রর বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক পদে এলেন, রিসার্চ স্কলার হলেন। এই স্থানেই মেধাবী শৈলেন্দ্রনাথ এর নাম থাকতে পারতো কিন্তু প্রতিভা সম্পন্ন শৈলেন্দ্রনাথ এর প্রতিশ্রুতিময় জীবনের করুণ পরিণতি ঘটে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বাধীনতা সংগ্রাম কতটুকু লাভবান হয়েছে, তার বিচার না করেও বলা যায় ভারতীয় বিজ্ঞান জগতের ক্ষতি হয়েছে অপূরণীয়। প্রতিভার পূর্ণবিকাশ এর পূর্বেই তার জীবনগতি অন্য খাতে প্রবাহিত নাহলে বিজ্ঞান জগতের সত্যেন্দ্রনাথ , মেঘনাদ সহ অন্য বিজ্ঞানীদের পাশে শৈলেন্দ্রনাথ এর নাম স্বর্ণাক্ষরে শোভা পেত।

সায়েন্স কমিউনিকেটর ও
বিভাগীয় প্রধান
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ
বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা
arnab_jour@Yahoo.co.in
arnab.vjrc@gmail.com

জগদীশ বসুর লিপিযন্ত্রে গাছের সাড়া

শিবশঙ্কর রায়: আমরা জানি উদ্ভিদ জগত একটি নীরব প্রকৃতির জগত...তা কি সত্যিই নীরব? আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু সেই জগতের নীরব উদ্ভিদের থেকে সাড়ার সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করে গেছেন ওনারই আবিষ্কৃত বিস্ময়কর যন্ত্রগুলির সহিত। উদ্ভিদের এই সাড়ার লিপির ভঙ্গিমার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে উনি উদ্ভিদের বর্তমান ও ইতিহাস সম্পর্কিত বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিস্তর আলোকপাত করে গেছেন ওনারই পুস্তকে। জগদীশ চন্দ্র বসু উদ্ভিদ গবেষণাতে যে কৃতিত্ব সাক্ষর রেখে গেছেন এখানে

Oscillating Plate Phytograph

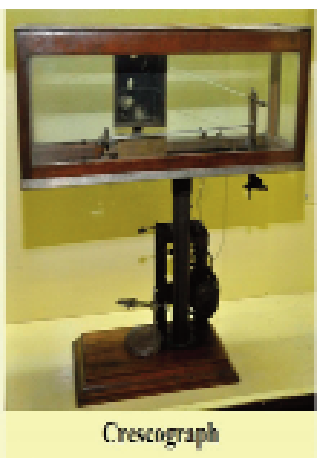

Crescograph

OPTICAL SPHYGMOGRAPH

Photosynthetic Bubbler

তারই সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর উত্তেজনা প্রসুত সাড়ার মধ্যে মৌলিক ঐক্য সন্ধানই ওনার গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল। তিনি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার সূচনাতেই বুঝতে পেরেছিলেন উদ্ভিদের পর্য-বেক্ষণের জন্য উপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন খুবই অপরিহার্য। তিনি দেখিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সহিত উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপের উপর যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয়না বলে অনেক ক্ষেত্রে মনগড়া মতের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণার এই ত্রুটি দুর করার জন্যই পদার্থতত্ত্বের ওনার গভীর জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং বহুদিনের সাধনায় ধাপে ধাপে উদ্ভাবন হয়েছিল উদ্ভিদ বিষয় গবেষণার বহুবিধি নিখুত সূক্ষ্ম যন্ত্র যেমন- Phytograph (গাছের অঙ্গ সঞ্চালন রেকর্ড হত), Crescograph (উদ্ভিদের বৃদ্ধি রেকর্ড হত), Resonant Recorder (উদ্ভিদ দেহে উত্তেজনার গতিবেগ নির্ণয় হত), Optical Sphygmograph (কাণ্ডের ব্যাসের ক্রমিক বৃদ্ধির সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরা যেত), Electric Probe (গাছের বৈদ্যুতিক সক্রিয় স্তর নির্ণয় হত), Photosynthetic Bubbler (আলোকসংশ্লেষ পরিমাপ করত)। এই সকল স্বয়ংলিপি যন্ত্র তে মনে হত যেন গাছ নিজে স্বহস্তে লিখে সাক্ষর দিচ্ছে।

উদ্ভিদের যান্ত্রিক সাড়ার (বৃদ্ধি, অঙ্গ সঞ্চালন ইত্যাদি) উপর অন্যান্য বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব উপেক্ষা করে শুধু নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব লিপিবদ্ধ করার জন্য উনি যন্ত্রগুলোকে এক অভিনব পদ্ধতিতে বানিয়েছিলেন যেখানে পর্যবেক্ষণের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করা যেত। এর ফলে অল্প সময়ের ব্যাবধানে (১ - ০.১ sec) উদ্ভিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যেত, কারণ অল্প সময়ে অন্যান্য বাহ্যিক অবস্থার পরি-বর্তন উপেক্ষা করা সম্ভব।

এছাড়াও উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়ার বিষয়ে বিস্তরভাবে গবেষণার ফলস্বরূপ উনি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন উদ্ভিদের উত্তেজনা পরিবহন বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্নায়ুধর্মী।

স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে ওনার এই গবেষণা সম্প্রতি উদ্ভিদগবেষণার মহল কে এক নতুন দিশা দেখিয়ে চলেছে।

রিসার্চ স্টুডেন্ট
কগ্নিটিভ অ্যান্ড সাইবারনেটিক্স ল্যাব,
আইএসাই, কলকাতা ও
ফিজিওলজি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
electrobiophysics@gmail.com

স্বাধীনতার পঁচাত্তর: বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালি মেয়েরা

সোমা বসু: মেয়েরা বিজ্ঞান পারে না, অংক পারে না - প্রচলিত সামাজিক এই ধারণাকে নস্যাৎ করে ১৮৭৮ সালে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে প্রথম এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন বাংলার মেয়ে কাদম্বিনী বসু (পরবর্তীকালে গাঙ্গুলি)। তিনিই প্রথম নারী - সারা ভারতবর্ষের মধ্যে। তিনি যখন 'বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে-ছিলেন, তখন খোদ ইংল্যান্ডেও মেয়েরা তা পারেন নি-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা খোলার জন্য তখন তাঁরা লড়াই চালাচ্ছেন। কাদম্বিনীর এই সাফল্যে বাংলার মেয়েরা সেদিন আলোর পথ দেখেছিলেন। অবলা বসু (আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর স্ত্রী) - প্রথম বাঙালি মেয়ে, যিনি প্রথম সাহস করে বাংলার বাইরে (তখনকার মাদ্রাজ) গিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কাদম্বিনী ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। তখন ব্রিটিশ যুগ। পাহাড় প্রমান সামাজিক বাধা পেরিয়ে, রাষ্ট্রের নিয়মকানুনের বেড়াজাল টপকে, অনেক লড়াই করে সে ইতিহাস তিনি তৈরি করেই ছেড়েছিলেন। তাঁর দেখানো সেই পথে একে একে হেঁটে এসেছেন বিধুমুখী বসু সহ আরো অনেকেই। মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, কেউ চিকিৎসক হয়েছেন, কেউ প্রকৌশলীবিদ, আবার কেউবা বিজ্ঞানী। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে যেখানে মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়াটাই ছিল এক কঠিন-কঠোর লড়াইয়ের ব্যাপার, সেখানে এঁরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে প্রমাণ করেছিলেন - মেয়েরা অংক পারে। প্রাক স্বাধীনতা যুগের সেই সব লড়াকু বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ছিলেন বিভা চৌধুরি, অসীমা চট্টোপাধ্যায় - বিজ্ঞানের জগতে এঁনাদের অবদান অপরিসীম। এঁদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা, গবেষণা 'মেয়েরা অংক পারে না' - এই প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিতে পেরেছিল। আর তাইতো স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে দেখি "মেয়েরা অংক পারে" বলেই বিজ্ঞানের নানান শাখায় ক্রমেই তাঁরা জায়গা করে নিয়েছেন।

বিভা চৌধুরি (জন্ম: ১৯১৩) গবেষণা করতেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল - পার্টিকেল্ ফিজিক্স এবং কসমিক রে। অসীমা চট্টোপাধ্যায় (জন্ম: ১৯১৭) - প্রথম মহিলা যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৪ সালে জৈব রসায়নে ডক্টরেট পান। পরবর্তী কালে আজীবন তিনি মেডিসিনাল প্ল্যান্ট নিয়ে গবেষণা করে গেছেন। আবিষ্কার করেছেন এমন অনেক

উপাদান, যা নানান রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাঁর অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। অনেকেই। তাঁর নিজের মেয়ে জুলি ব্যানার্জি-ও একজন কৃতী বিজ্ঞানী। মা-মেয়ের এই জুটিকে বলা হয় - ভারতের 'কুরী ফ্যামিলি'।।

স্বাধীনতার পর সমগ্র ভারতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল মাত্র দশ শতাংশ, সেখানে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তেন পাঁচ শতাংশের মতো। কিন্তু, মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই (১৯৫০ সাল) তা বেড়ে হয় কুড়ি শতাংশ। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোতেও মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে হয় দশ শতাংশ। মেয়েরা যে শুধু বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেন তাই নয়, শিক্ষা শেষে কেউ যোগ দিলেন স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকতার কাজে, কেউ বা গবেষণায়। যেমন, পূর্ণিমা সিনহা (সেনগুপ্ত)গবেষণা করতেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে, প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী যিনি পদার্থবিদ্যায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭ সালে ডক্টরেট পান। বোস ইনস্টিটিউট থেকে ডক্টরেটপ্রাপ্ত প্রথম মহিলা মলিকিউলার বায়োলজিস্ট মহারানী চক্রবর্তী। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ব্যাক্টেরিওফাজ (যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে)। জেনেটিক্স, ডি এন এ টেকনোলজি গবেষণায় তিনি ভারতে এক নব দিগন্তের সূচনা করেন। উদ্ভিদবিদ শিপ্রা গুহ মুখার্জি ১৯৬৩ সালে জহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে বটানিতে ডক্টরেট করেন। প্লান্ট টিস্যু কালচার গবেষণাতে তিনিই পথিকৃৎ। এছাড়াও রয়েছেন মঞ্জু রায়, অর্চনা ভট্টাচার্য, চারুশীলা চক্রবর্তী, রাজেশ্বরী চ্যাটার্জি সহ আরো অনেকেই যাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে বিজ্ঞান জগত।

যাঁদের দেখানো পথে উৎ-সাহিত হয়ে মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন বলেই ২০০০ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে গড়ে ভারতের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে চল্লিশ শতাংশ মেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন।

প্রাক্তন অধ্যাপক
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ,
নেপাল
soma25kolkata@gmail.com

জৈব বিবর্তন

ইচ্ছেমত পরিবর্তন?

সম্রাজ সিংহ: "হাঁস ছিল, সজারু ব্যাকরণ মানিনা, হয়ে গেলো হাঁসজারু কেমনে তা জানি না" সুকুমার রায়ের এই বিখ্যাত লাইনটি আমাদের সকলেরই শোনা। কিন্তু আমরা কি জানি এই রকম কিছু কার্যকলাপ বাস্তবেও করা সম্ভব। হ্যাঁ, বিজ্ঞানের বদান্যতায় Crispr-Cas টেকনলজি দিয়ে যে কোনো প্রাণীর জেনেটিক গঠন পাল্টে (genome editing) তার কিছু চারিত্রিক পরিবর্তন করা যেতেই পারে। Emmannulle Charpentier এবং Jennifer Dounda নামে দুজন প্রতিভাময়ী বিজ্ঞনি কেমিস্ট্রিতে এই বিষয় গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ২০২০ সালে। তবে নোবেল প্রাইজ কেন? এই দুজন গবেষক ২০১১ সাল থেকে এই বিষয় কাজ করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গবেষণাগার সহজেই এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে নানা বিধ সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। আমরা জানি যে কোনো প্রাণীর গঠন ও চরিত্র প্রধানত তার DNA sequence এর ওপর নির্ভর করে। এই Crispr-Cas (genetic Scissor) দিয়ে সিকুয়েন্সটি কোন জায়গাতে কিছুটা পরিবর্তন (cut-paste) করলে বিভিন্ন জেনেটিক অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়া, জীবাণু প্রতিরোধকারী শস্য দানা তৈরি করা, ইত্যাদি সম্ভব। এমন উদাহরণও আছে যে মশার মধ্যে এই জাতীয় পরিবর্তন এনে, ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনের ক্ষমতা খর্ব করা গেছে। হালে করোনা ভাইরাস দ্রুত টেস্টের জন্য এবং ভাইরাসের genome কে আক্রমণ করার পন্থা হিসেবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

তবে মানুষ, এই দান তার তথাকথিত আরেক শত্রু ব্যাকটেরিয়ার থেকেই পেয়েছে। ভাইরাস শুধু মানুষের নয় ব্যাকটেরিয়ার জন্যেও ক্ষতিকারক, এরা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ঢুকে প্রজনন করে এবং শেষে কোষটিকে ফাটিয়ে বেড়িয়ে যায়। তাই নিজের রক্ষার্থে Crispr নামক এই রিপিট সিকুয়েন্স তাদের মধ্যে থাকে, এবং ভাইরাসের genetic material কে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে (Guide RNA এর মাধ্যমে) তারপর Cas এন্সাইম টির দ্বারা তা টুকরো করে ফেলে, ফলত ভাইরাস আর বৃদ্ধি পেতে পারে না।

বিজ্ঞানিরা এই Guide RNA ইচ্ছে মতো তৈরি করে জাতে DNA sequence এর যে জায়গা টা দরকার সেখানটা এটি ধরতে পারে এবং কেটে অন্য সিকুয়েন্স লাগিয়ে দেওয়া যায়। যেমন কোন জেনেটিক রোগের সিকুয়েন্স সরিয়ে প্রতিরোধক জিন লাগানো। Crispr-Cas এর এই দুটি কম্পোনেন্ট কেই plasmid এর সাহায্যে কোষের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়।

২০১১ সালে, Streptococcus pyogenes নামক এক ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে, Charpentier আবিষ্কার করেন tracr-RNA (পড়ে guideRNA হিসেবে ব্যবহিত), অন্য দিকে Doundo করেন Cas প্রজাতির জিন ও প্রোটিন গুলি। তারপর দুজনের একত্র প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় এই নতুন উদ্ভাবনের মধ্যে।

তবে এই নব্য প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছু অসুবিধের সম্মুখীন হতে পারে মানবজাতি। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জিনোম এতই জটিল যে টা নিয়ে কাটা ছেঁড়া করলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে এবং বংশানুক্রমে তা সংক্রমিত পর্যন্ত হতে থাকতে পারে। এ ছাড়া কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে কোন একটি জায়গা কাটতে গিয়ে জিনের অন্য জায়গা কেটে গেছে, তাই specificity আরও উন্নত করতে হবে।

চীনের এক বিজ্ঞানি, জিয়ানকুই এই ধরনের পরীক্ষা নিরিক্ষা মানুষের ওপর করার কারনে বিভিন্ন আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পরেছেন। এর আরও একটি খারাপ দিক হোল, আর্থিক ক্ষমতাবান কিছু মানুষ যদি নিজের হবু সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠন ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করতে চায় তাহলে সমাজ ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পরবে, বর্ণ বিদ্বেষের প্রাদুর্ভব হবে।

এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসেই ক্যান্সারের তিনজন রোগীর ওপর modified T cells দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সুফল পাওয়া গেছে।

বংশগত চোখের সমস্যার একজন রোগীকে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করা গেছে। Crispr Therapeutics নামে এক কম্পানি এও জানিয়েছে যে থ্যালাসেমিয়া ও অ্যানিমিয়ার দুজন রোগীর আর রক্তদান দরকার পরবে না এই Crispr থেরাপির (bone marrow stem cells editing) পর। US-eGenetics চেষ্টা করছে যাতে এই প্রযুক্তি দিয়ে শূয়োরের কিছু জিন এমন ভাবে পালটানো যায় যাতে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়। আর বিভিন্ন ধরনের ঐচ্ছিক চরিত্র সম্পন্ন রোগ প্রতিরোধক, উন্নত স্বাদ ও মানের শস্য উৎপাদন করার বিভিন্ন উদাহরণ তো আছেই।

এই বিজ্ঞানের দানকে মানুষ তাদের হিতে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষাই সফল হবে যা হয়তে আজকে অবাস্তব।

গবেষক
বায়োলজিক্যাল সায়েন্স বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
sinhasamraj@gmail.com

ভারতে মহাকাশবিজ্ঞানের জনক বিক্রম সারাভাই

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়: স্বাধীনতা লাভের পর দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মহাসড়ক তৈরির কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পদার্থবিজ্ঞানী বিক্রম আম্বালা সারাভাই তাঁদের অন্যতম। ভারতে মহাকাশ গবেষণা ও রকেট প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং সুদূরপ্রসারী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনায়। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মাত্র বাইশ জন নবীন বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রম কাজে লাগিয়ে বিক্রম সারাভাই মহাকাশ গবেষণা ও রকেট প্রযুক্তির বিশ্ব সভায় ভারতকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ড. সারাভাই বুঝেছিলেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেশে মৌলিক গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন একটি উপযুক্ত গবেষণাগার। সেইমতো ১১ নভেম্বর ১৯৪৭ সালে আমেদাবাদে তিনি স্থাপন করেন ফিজিকাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (সংক্ষেপে পি আর এল)। পরবর্তীকালে এই সংস্থাটি ভারতে মহাকাশ গবেষণার যন্ত্রপাতি ও লোকবল সরবরাহের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ড. সারাভাই-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান 'ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন' প্রতিষ্ঠা করা।

বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা সবাই স্বীকার করেন যে তাঁর সঙ্গে কাজ করার মজাই ছিল আলাদা। তিনি কখনই কারও কাজের খুঁত ধরতেন না। বরং কারও কোনো সমস্যা হলে তিনি সঠিক পথ বাতলে তাঁকে উৎসাহ দিতেন।

অধ্যাপক সারাভাইয়ের নেতৃত্বে যখন দেশের মহাকাশ গবেষণার কাজ সুষ্ঠু ভাবে এগিয়ে চলেছে তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটে। ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানচর্চার জনক চলে গেলেন। এস এল ভি-৩ রকেটের কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারেননি ঠিকই তবে

যোগ্য উত্তরসূরি রেখে গিয়েছিলেন যাদের হাত ধরে ভারত আজ চাঁদের আকাশ ছুঁয়ে মঙ্গলের আকাশে পাড়ি দিয়েছে।

অধ্যাপক সারাভাই ১৯৬২ সালে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর মেডেল পান। ১৯৬৬ সালে পদ্মভূষণ এবং ১৯৭২ সালে পদ্মবিভূষণ প্রদান করে দেশ তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯৭১ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই মহান বিজ্ঞানীর অকাল প্রয়াণ ঘটে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক
ও প্রবন্ধিক
kbb.scwriter@gmail.com

বিজ্ঞানে 'অস্কার' পেলেন শঙ্কর বালাসুব্রহ্মণ্যম

বেবী সরদার: ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক, ডিএনএ-র জটিল রহস্য অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ভেদ করার উপায় আবিষ্কারের জন্য রসায়নবিদ শঙ্কর বালাসুব্রহ্মণ্যম পেলেন বিজ্ঞানের গবেষণায় শীর্ষস্তরের স্বীকৃতি বিজ্ঞানের 'অস্কার'। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ডিএনএ'র রহস্যভেদের জন্য এ বছর শঙ্কর বালসুব্রহ্মণ্যম পুরস্কার ভাগাভাগি করে নিয়েছেন আর এক ব্রিটিশ রসায়নবিদ ডেভিড ক্লেনারম্যানের সঙ্গে। তাঁরা দু'জনেই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের প্রধান প্রযুক্তি। কত দ্রুত গতিতে জিনোমের সিকোয়েন্স করা যায় তার উপায় বাতলানোর জন্য। যা হয়ে উঠবে আগামী প্রজন্মে মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের প্রধান প্রযুক্তি।

চেন্নাইয়ে ১৯৬৬ সালে জন্ম গ্রহণকরেন শঙ্কর। জন্মের দু'বছরের মাথায় শঙ্করকে নিয়ে তাঁর বাবা-মা চলে আসেন ব্রিটেনে। তারপর শৈশব কাটে চেশায়ারের একটি গ্রামাঞ্চলে। ভর্তি হন ডারেসবারি প্রাইমারি স্কুলে। পরে পড়তে যান ব্রিজওয়াটার হাই স্কুলে। শঙ্কর তারপর যান কেমব্রিজের ফিট্জউইলিয়াম কলেজে ন্যাচারাল সায়েন্সে ট্রাইপস করতে। মাস্টার্সের পর সেখানেই শঙ্কর পিএইচ. ডি. করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক বিজ্ঞানী ক্রিস অ্যাবেলের তত্ত্বাবধানে। গবেষণা শেষ করে শঙ্কর ১৯৯১ সালের শেষের দিকে ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত দেশের রিসার্চ ফেলো হিসাবে যান আমেরিকায়। গবেষণা করেন পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরেই ব্রিটেনে ফিরে যোগ দেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । হন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য। ২০০৮ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অত্যন্ত সম্মাননীয় হার্শেল স্মিথ চেয়ার প্রফেসর হন শঙ্কর। ২০১৭ সালে রানির কাছ থেকে পান 'নাইটহুড' খেতাবও। ২০১৮ সালে পান রয়্যাল মেডেল। এখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের গবেষণাগার গুলোর তিনি অধিকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার গবেষণা বিভাগেরও প্রধান শঙ্কর বালাসুব্রহ্মণ্যম। ২০১২ সালে সদস্যপদ দেওয়ার সময় শঙ্কর সম্পর্কে রয়্যাল সোসাইটি বলেছিল, 'নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণায় শঙ্কর একজন পথপ্রদর্শক এই সময় এবং পরবর্তী প্রজন্মের গবেষকদের কাছেও।' 'শঙ্কর ও তাঁর সহযোগী পুরস্কার প্রাপক দের কাজ, তাঁদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মানুষের গোটা জিনোমকে বুঝে ফেলার গতি অত্যন্ত দ্রুত , অন্তত ১০ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। যে কাজটা করতে আগে লাগত এক দশকেরও বেশি সময়, তা এখন এক ঘণ্টায় করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাবন্ধিক
babysardarsaha@gmail.com

শ্রমের ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বিজ্ঞান

তুহিন সাজ্জাদ সেখ: মানুষ সমাজবদ্ধ জীব; আর সেই সমাজে সাহিত্য ও দর্শন যদি মূল্যবোধের জন্ম দিয়ে থাকে তবে বিজ্ঞান নিরন্তর সমাজে সমস্ত বিষয়ের মূল্যমান বৃদ্ধি করে চলেছে--- তাতে কোন সন্দেহই নেই। সভ্যতায় শিক্ষা, শ্রম ও দক্ষতার মান বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান সদা নিয়োজিত--- পরীক্ষাগার থেকে প্রেক্ষাগৃহ, মহাশূন্য থেকে ভূগর্ভ সর্বত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষা ও শ্রমের মানোন্নয়নে নতুনত্বের প্রভাব বিষয়ে আলোচনার আঙ্গিকে এই বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হল জাতীয় বিজ্ঞান দিবস - এই উপলক্ষে ওই দিন তুরিয়া কমিউনিকেশনস এল এল পির কারিগরি সহযোগিতায় ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাকাডেমী ও ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি আন্তর্জালিক বিজ্ঞান সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সন্ধ্যার শুভারম্ভে তুরিয়া কমিউনিকেশনস-এর কর্ণধার মিস সন্ধ্যা সুতোদিয়া সকলকে হার্দিক স্বাগত জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি আজকের দিনে দ্রুত এবং গুণসম্পন্ন বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়করনের জন্য সামাজিক মাধ্যম গুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

এরপর অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. অমিত কৃষ্ণ দে ওয়েব সেমিনারে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং উপস্থিত বক্তা দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন-এর সচিব অধ্যাপক সুধেন্দু মন্ডল মহাশয়কে ওই আলোচনা ক্রমের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার আহ্বান জানান। অধ্যাপক মন্ডল তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই আমাদের মনে করিয়ে দেন ১৯৮৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি-র কথা যেদিন ড.সি ভি রামন তাঁর জগৎ বিখ্যাত আলোর বিচ্ছুরণের ঘটনাটি আবিষ্কার করে ছিলেন,যা "রামন এফেক্ট" নামে পরিচিত। ওই বছর থেকেই ২৮ শে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে। তিনি বিজ্ঞানে নতুন উদ্ভাবনী ধারনার জন্মের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেন। ১৮৭৪, ১৮৯৪, ১৮৯৫ প্রভৃতি সালে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন গল্পের মধ্যে এই উদ্ভাবনী ধারনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি ড. রোনাল্ড রসের কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা, শ্রম ও সমাজের বুকে উদ্ভাবনী ধারনার কথা প্রসঙ্গে তিনি নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ ব্যানার্জী ও মাদার টেরেসা-র কথা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কথায় তিনি ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন-এর কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহা ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এরপর ড. অমিত কৃষ্ণ দে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির সভাপতি ড. জাভেদ আহমেদের একটি প্রেরিত তথ্য পড়ে শোনান। উক্ত তথ্যে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপনের জন্য সকলকে হার্দিক স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের দিনে আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন, বিপদাপন্ন ও লুপ্তপ্রায় পক্ষী দের সংরক্ষণ,দাবানল, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা পেতে বিজ্ঞানের অপরিসীম ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবহে প্রত্যয়ের অবস্থান গবেষণা কে ত্বরান্বিত করেছে। অংশীদারি সিদ্ধান্তে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর গবেষণা হচ্ছে--- যা আগামী দিনের রূপান্তরের নির্দেশ দেয়। এরপর ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাকাডেমীর (নেসা) পশ্চিমবঙ্গ শাখার সহ-সভাপতি ড. কৃষ্ণেন্দু দাস দীর্ঘ ৩১বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞান প্রচার প্রসার ও জনপ্রিয়করণের কাজে নেসা'র ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন নেসা 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান', ' এনভাইরোনিউজ', ' বায়োকেম' নামে তিনটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তার পর ড. দে এই আলোচনা ক্রমের প্রথম বক্তা স্প্রিংরিভার টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড-এর সহ-নির্মাতা এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ড. প্রবীর আদিত্য মহাশয়কে আহ্বান জানান তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য। তিনি তাঁর কথা শব্দ চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন বিজ্ঞান হল জ্ঞানের সৃষ্টি যেমন ইলেক্ট্রনিক্স, প্রযুক্তি হল জ্ঞানের প্রয়োগ যেমন মোবাইল ফোন এবং ইনোভেশন অর্থাৎ আবিষ্কার হল প্রযুক্তির প্রয়োগ যেমন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং। তিনি বলেন কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিনে দিনে সমাজ ও সভ্যতায় বদল নিয়ে আসছে।

চিরাচরিত বিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষ আজ সবটাই অন্তর্জালে। ছাপানো পাঠ্য বইয়ের জায়গায় অজস্র 'ওয়েব কনটেন্ট'। দেশের 'সিটিজেন' আজ বৃহত্তর বিশ্বের নেটিজেন'। শিক্ষা শ্রম ও দক্ষতার বিবর্তন হচ্ছে ক্রমাগত। অন্তর্জালের কাল্পনিক দুনিয়ায় আজ বাস্তবের রূপ নিয়েছে। শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি,ব্যবসা বাণিজ্য, দেশের সুরক্ষা সবজায়গায় আজ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ জনজীবন কে দারুন ভাবে প্রভাবিত করছে।

আলোচনা ক্রমের দ্বিতীয় বক্তা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, ভুবনেশ্বর- এর মুখ্য বিজ্ঞানী ড. মৌসুমী রায়চৌধুরী তাঁর শব্দ চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরেন কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রভাবের কথা। ভারতবর্ষের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ভারতের জাতীয় আয়ের (জি ডি পি) মাত্র ১৫.৪ শতাংশ আসে এই কৃষিক্ষেত্র থেকে। অর্থাৎ ভারতের চাষীদের মাথা পিছু জাতীয় আয় শতকরা এক টাকারও কম। তাই ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র অনুন্নত ও অসংরক্ষিত; এই ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধনের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। উন্নত ফলনশীল বীজ তৈরি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি, উন্নত কীটনাশক,সার এবং নতুন উদ্ভাবনী কৃষি পদ্ধতির রূপান্তরের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রের অনেক উন্নতি সাধন হয়েছে। উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার মাটি ও আবহাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুকূল চাষাবাদের পরামর্শ চাষীদের দারুন ভাবে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরন্তর গবেষণা সবসময় মানুষের হিত চিন্তা করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর কর্মজীবনের অনেক নজির তুলে ধরে চাষাবাদে বিজ্ঞানের অপরিসীম ভূমিকার কথা আরও বিশ্লষ্ত করে তোলেন।

ড. দে'র অনুরোধে নেসা'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক ড. সুভেন্দু পাত্র উক্ত বিজ্ঞান সন্ধ্যাটিকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য বক্তা ও শ্রোতা,আয়োজক ও প্রচারক সকলকে ধন্যবাদ জানান। তুরিয়া কমিউনিকেশনস-এর পক্ষ থেকে মিস সন্ধ্যা সুতোদিয়া মহাশয়া সকলকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ওই আলোচনা ক্রমের ইতি ঘোষণা করেন।

জনবিজ্ঞান প্রাবন্ধিক ও
আলেখ্যকার
tsk2317563@yahoo.co.in

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ...

৩>> প্রথম সম্পাদক রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র। এর পরে কিছুদিন যুগ্ম-সম্পাদক এবং তার পরেই পরে ১৯৭৬ পর্যন্ত পূর্ণ সম্পাদক ছিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এক প্রবাদপ্রতিম পত্রিকা সম্পাদক ও লেখক। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যাতে সাময়িক আবেগ-প্রসূত না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তৎকালীন পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্যরা প্রথম থেকে সচেষ্ট থেকেছেন। প্রতিষ্ঠার পর ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশনেই পরিষদের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়ে পরিষদ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। ঘটনার সমাপতনে ২১ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। পরিষদের গঠনতন্ত্র রচনা, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন, আর্থিক সুব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা, বিধি নিয়মাবলী গঠন সবকিছুর মধ্য দিয়ে প্রথম থেকেই একটি বিধিবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। যে সত্যেন্দ্রনাথ নির্বিশেষে দান করায় অভ্যস্থ, তিনিই একটি নিজস্ব গৃহ তৈরি করার জন্য নির্দ্বিধায় অপরের দান গ্রহণ করেছেন।

পরিষদ প্রথমে বিজ্ঞান কলেজ পরে ফেডারেশন হলের অস্থায়ী আস্তানা থেকে ১৯৬৯ সালে পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ স্থায়ী নিজস্ব ভবনে চলে আসে। সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে পরিষদের আজীবন সভাপতি (প্রয়াণ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) পদে বৃত ছিলেন।

পরিষদের সদস্য পদের নিয়মাবলীর মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল এর সদস্য হবার যোগ্যতা। নারী, পুরুষ, জাতি, ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে মাত্র ১৮ বছর বয়েস হলেই যে কেউ পরিষদের সদস্য হতে পারবেন। এ থেকে বোঝা যায় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে বিজ্ঞানের আঙিনায় আনাটা কত গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়েছে।

প্রথম থেকে বিজ্ঞান পরিষদ কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ণে সচেষ্ট থেকেছে। বর্তমান কর্মসূচীর কয়েকটি (১) নিয়মিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশনা। (২) জনবোধ্য বিজ্ঞানের বই প্রকাশ। এ যাবৎ প্রায় সত্তরটি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পুস্তক। ২০টি বই ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন। সত্যেন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫তম বর্ষে প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'জীবন ও কৃতি' বইটি।

(৩) নিয়মিত বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, আলচেনা আয়োজন। বর্তমানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি বক্তৃতা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা, রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা সহ বিভিন্ন বক্তৃতা আয়োজিত হয়।

(৪) প্রতি বছরের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য যোগমায়া বসু পুরস্কার এবং কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরের শ্রেষ্ঠ লেখার জন্য দেওয়া হয় অমলেশ তালুকদার পুরস্কার। বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে সার্বিক অবদানের জন্য দেওয়া হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান পুরস্কার। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পুরস্কার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অবদান, বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে দেওয়া হয়।

(৫) হাতে কলমে বিভাগ : সত্যেন্দ্রনাথের সময় থেকেই এই বিভাগটি চালু আছে। কর্মহীন ছেলেমেয়েদের হাতে কলমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত শিক্ষা, যোগথেরাপী, ফিজিওলজি সহ বিভিন্ন কোর্সে খুব কম খরচে শিক্ষাদান করা হয়।

(৪) পরিষদের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পাঠাগার ও গ্রন্থাগার আছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের ডিজিটাইজেশনের কাজ চলছে।

(৫) সত্যেন্দ্রনাথ বসু সংগ্রহশালা। (সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পোষাক, সার্টিফিকেট, ফোটোগ্রাফ ইত্যাদি নানা সামগ্রীর প্রদর্শনী।

(৬) অন্যান্য কর্মসূচী, লেখক পাঠক মাসিক ও বার্ষিক সভা। ২০১৮-১৯-এ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল, কলেজে শতাধিক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে সত্যেন্দ্র-নাথ জীবন ও কৃতি নামক একটি বই।।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জন-প্রিয়করণের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের পঁচাত্তরতম বর্ষে পদার্পণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২৫ জানুয়ারি ২০২২ পঁচাত্তরতম বর্ষে পদার্পণ করবে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সেই স্বপ্ন রূপায়ণে এগিয়ে চলেছে।

সুমিত্রা চৌধুরী
সভাপতি
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন

সায়েন্টিফিকা কম্যুনিকা.....

১>> গুরুত্বপূর্ণ এবং সংস্থার জন্য গৌরবময় বলেও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান প্রসার এর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক ডক্টর টি ভেঙ্কটেশ্বরন।

ইসনার অন্যতম সেক্রেটারি হিসেবে ডক্টর অমিত কৃষ্ণ দে জানান যে প্রতিবছর ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বিজ্ঞান সংবাদিকতার ওপর একটি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করা হয় যা বিগত বছরে অর্থাৎ দুই হাজার কুড়ি সালে আয়োজিত হয়নি, করোনার আবহে। কিন্তু ২০২১ সালে এটি আবার আয়োজন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং আগামী দিনেও ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসো-সিয়েশন তার এই কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এর পাশাপাশি তিনি এটিও জানান যে, এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের প্রলম্বিত অংশ হিসেবেই আরেকটি সাতদিনের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সাংবাদিকতার অনলাইন কোর্স করা হচ্ছে । এটিতে বিশ আগস্ট পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে আবেদনকারীদের অন-লাইনে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট সা-ংবাদিক শ্রী উদয় বোস।প্রধান অতিথি হিসেবে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন তিনি এবং তার আলোক-পাতের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সমৃদ্ধ হন। তিনি বলেন করোনাকালে প্রথমদিকে টিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল এবং ক্রমশ এই বিভ্রান্তি কমেছে আর এই ভ্রান্তি কমার ক্ষেত্রে অবদান আছে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার।আধুনিক সমাজের কাছে সব মাধ্যম কে ব্যবহার বিজ্ঞানের বিষয়কে তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভ্রান্তি দূর করার গুরুত্ব যে কতটা তা কোভিড কালের প্রেক্ষিতে সকলেই বুঝছেন এমনটাই তিনি বলেন। তিনি বলেন অনলাইন মাধ্যম বর্তমানে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের পথ কে আরো ইতিবাচক ভাবেই প্রশস্ত করেছে। বিজ্ঞান সাংবাদিকতার মধ্যে এক সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেন । অনুষ্ঠানের এই পর্বে ইংরেজি ভাষায় অন্তর্জালিক পত্রিকাটির উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রী প্রশান্ত বোস। এবং অন্তিম লগ্নে সংস্থার প্রেসিডেন্ট ডঃ মুরালিধরন বলেন সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বের কথা এবং তিনি এক্ষেত্রে তুলে ধরেন ভারতীয় ইতিহাসের উদাহরণ। তিনি বলেন মানুষের সাথে প্রকৃতির যোগাযোগের সেতুটিকে আরও মজবুত করার কথা। আর এক্ষেত্রে বিজ্ঞান সাংবাদিক দের অবদান যে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেটিও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন শ্রোতা দের।

ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন প্রাক্তন বিদ্যার্থী তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন অনুষ্ঠানে শেষ লগ্নে অংশগ্রহণকারীদের সাথে। এক্ষেত্রে বর্ণিনী ভট্টাচার্য বলেন যে সাইন্টিফিকা কম্যুনিকা সম্পাদনার কাজে অংশ নিয়ে তিনি তাঁর ভাবনার জগৎ কে বিস্তৃত করতে পেরেছেন।

আরেক প্রাক্তনী সুকল্যাণ গাইন ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের পঠনপাঠনের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনলাইন অনুষ্ঠানে শ্রোতা হিসেবে একাধিক কৃতী প্রাক্তনীরা উপস্থিতি ছিলেন ।

শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর অর্ণব কুমার ব্যানার্জি। তিনি এই মহতী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত সকলকে পাশে থাকার জন্যে ধন্যবাদ জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয় গুগল মিটের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করা হয় এবং এর পরে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
আসানসোল গার্লস কলেজ
ও প্রাক্তন ছাত্র
ইসনা
dr.malyaban@gmail.com

কর্মশালা..

১>> শ্রাব্য ও দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, এ বিষয়ে বলেন ড. মানসপ্রতিম দাস এবং বিশ্বজিৎ দাস। সভাপতিত্ব করেন প্রশান্ত কুমার বসু। বিজ্ঞান সংগঠনের পত্রিকা বিষয়ে বলেন, দীপক কুমার দাঁ এবং ড. অরুনাভ মিশ্র। সভাপতিত্ব করেন ড. সুমিত্রা চৌধুরী।

বিজ্ঞানের জন্য কি লিখবো এ-বিষয়ে বলেন ড. শ্যামল চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন ড.সুধেন্দু মন্ডল। সামাজিক গণমাধ্যমে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা এ বিষয়ে বলেন, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত ও বকুল শ্রীমানি। সভাপতিত্ব করেন শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ। হাতে কলমে বিজ্ঞান সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণ দেন, ড. সীমা

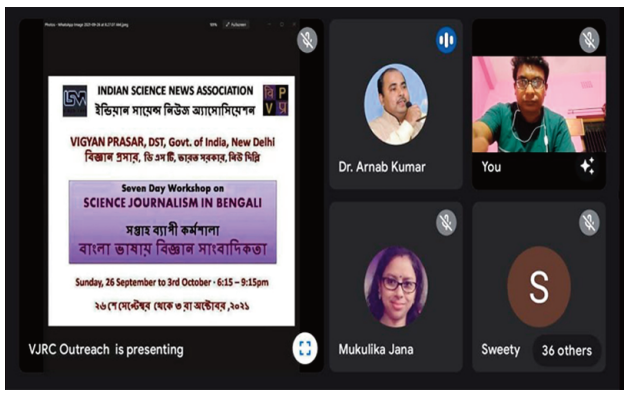

মুখোপাধ্যায়, ড.শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, শিব শঙ্কর দত্ত। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন, ড.মৃন্ময় চন্দ। সভাপতিত্ব করেন রুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ধারা। মেন্টর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মীনাক্ষী দে, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শীতেন্দু মন্ডল, ড.অরুণ কুমার চক্রবর্তী, ড. জুলি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ।

এছাড়া সাতজন র‍্যাপোর্টিয়ার এবং সাতজন সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিল ইসনার প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা। কর্মশালার শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান বার্তা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

বায়ো-ফার্মিং...

১>> স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন উঠবে ওর এই ব্যাপক কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যটি কি? ওর সোজাসাপ্টা জবাব জৈব॥ জীবাণুসার এবং বায়োফার্মিংএর ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এত বড় দেশ, এত বিশাল জায়গা এবং এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে গেলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করলেও জৈব সারের প্রয়োগ আরও বেশি প্রয়োজন। কারণ বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরাশক্তি কমে যাচ্ছে ও ঐ জমি দূষিত হচ্ছে। কৃষির কি উন্নতি হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। যেখানে ১৯৫০ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, আজ সেই পরিমাণ পৌঁছেছে ৩০০ মি-লিয়ন মেট্রিক টনে। একই সময়ে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ০.৭ মিলিয়ন টন থেকে ২৮ মি-লিয়ন টনে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জমিকে নিঙড়ে নেওয়া হয়েছে। জমিতে সার দিতে গেলে আদর্শ পরিমাণ বিধি হওয়া উচিৎ - নাইট্রোজেনঃ ফসফরাসঃ পটাশিয়াম ৮:২:১ অনুপাতে। কিন্তু এই অঙ্ক কোথাওই মানা হয়না, বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চলে। ফলে ৪০০ গুণ বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও সামগ্রিক ফসল উৎপাদন বেড়েছে মোটে ৬ গুণ।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটাই উপায় জৈব ও জীবাণূ সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা। তাছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের কথাও ভাবতে হবে। দেখা গেছে জমিতে বেশি নাইট্রোজেন সার দিলে তা অনেকটাই নষ্ট হয় এবং তা বাতাসে মিশে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি করে। অথচ বাতাসে ভাসমান ঐ নাইট্রোজেনকে কাজে লাগান যায় রাইজোবি-য়াম, এ্যাজটোব্যাক্টার প্রভৃতি জীবাণূ কাজে লাগিয়ে। পরিবেশও বাঁচে এবং শস্য উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি হয়। পরিতোষ আশাবাদী যে কৃষকরা ক্রমশ এর গূরুত্ব বুঝতে পারছে এবং এখন লিকুইড ব্যাকটেরিয়াল ফার্টিলাইজারের ব্যবহার অনেক গূণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বোঝা যাচ্ছে রাসায়নিক সার মাফিয়া বা লবির কাছে হার মানলে চলবেনা। একই সঙ্গে আশার কথা অর্গানিক ফার্মিংও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে সিকিম একটি অর্গানিক রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে মোটামুটি ১৮০টি দেশে অর্গানিক ফার্মিং এখন একটি পরিচিত নাম। আর লক্ষ্য রাখতে হবে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জিএম) শস্যের দিকেও। কারণ পরিবেশ সংরক্ষকদের মতে প্রকৃতির পক্ষে এই শস্য উপযোগী নয় যদিও এটির প্রসারের বিরাট চেষ্টা চলছে। এর স্বপক্ষে কিছু বিজ্ঞানীর যুক্তি যে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হয়ে ৯.৭ বিলিয়নে পৌঁছবে। এই বিপুল জনসংখ্যার মুখে খাদ্যশস্য তুলে দিতে গেলে জিএম ক্রপের সাহায্য নিতেই হবে। এর প্রচারে আমেরিকা পথিকৃৎ। অন্যদিকে অষ্ট্রেলিয়াসহ সারা পৃথিবীতে ৭১.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জৈবচাষ হচ্ছে। এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে। উঠে এল আরও অনেক কথাই। স্মরণ করা হল আমাদের প্রবাদপ্রতীম শিক্ষক, দুই উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রথীন্দ্রনাথ বসুকে।

বিদায় নেওয়ার আগে একটা আবৃত্তি হবেনা? সঙ্গে সঙ্গেই উদাত্ত কণ্ঠে আরম্ভ হল কবিগুরুর অবিস্মরণীয় "আফ্রিকা" উদভ্রান্ত সেই আদিম যুগে খবর পাওয়া গেল বেরিয়েছে ওর নতুন কবিতার বই সাতরঙা সাতসুর। পূজা সংখ্যায় লিখছে প্রয়াত শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে গবেষণামূলক রচনা।

এরপরেও কি পরিতোষকে কুর্ণিশ না জানিয়ে পারি?

প্রশান্ত কুমার বসু
সাংবাদিক ও
বিশিষ্ট লেখক
সম্পাদক
সায়েন্টিফিকা কমুন্যিকা
ও বিজ্ঞান কহন
bosepraanta@hotmail.com

বিজ্ঞান সংগঠন...

৩>> ১৯৫৮ সালে এই সংগঠনের নাম হয় আসাম সায়েন্স সোসাইটি। আসামের জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের চেতনা সম্প্রসারণে এই সংগঠন একাধিক কাজ করেছে। সংগঠনের মুখপত্র বিজ্ঞান জেউতি-তে অসমীয়া ভাষায় বিজ্ঞানের নানান দিকগুলো সহজ ও সরল ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সচেতনতায় এই সংগঠনের ভূমিকা নিতে দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম বাদেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও একাধিক বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ঝাড়খণ্ডের রোহিণী সায়েন্স ক্লাব, কেরালার শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, পডুচেরি সায়েন্স ফোরাম, মহারাষ্ট্রের অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি, মারাঠি বিজ্ঞান পরিষদ, দিল্লী সায়েন্স ফোরাম-এর মতো একাধিক সংগঠন বিজ্ঞান-মনস্ক সমাজ গড়ে তুলতে নানান পদক্ষেপ নেয়। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে সাংগঠনিককর্মীরা সাংগঠনিক বই, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, ভিডিও, স্লাইড প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছিল ।

১৯৬২ সালে র‍্যাচেল কারসন সাইলেন্ট স্প্রিং বইতে রাসায়নিক কীটনাশকজনিত দূষণের ভয়াল দিকটি তুলে ধরলে পরিবেশ বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা এক নতুন মাত্রা পায়। পরিবেশের প্রশ্নে প্রথম আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে, স্টকহোমে। বিশ্বজনীন পরিবেশ ভাবনার প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা প্রসারে সাংগঠনিক প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ রক্ষার্থে বিজ্ঞানকর্মীরা পথে নেমেছেন। বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশকের পরবর্তী সময়ে ভারতে যতগুলো পরিবেশ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সবক্ষেত্রেই বিজ্ঞান সংগঠন-গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে দেখা যায়।

সুকল্যাণ গাইন
পি এইচ.ডি. গবেষক,
ইতিহাস বিভাগ,কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
sukalyangain1@gmail.com

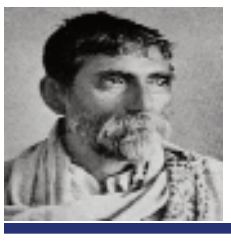

বিজ্ঞান কহন

কলকাতা/ অক্টোবর ৬, ২০২১, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন : বিজ্ঞান চেতনার এক মহান প্রতিষ্ঠান

মানস চক্রবর্তী: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায় ১৯৩৫ সালের জুন মাসে জনমানসে বিজ্ঞান চেতনার এক সংস্থা হিসাবে ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, সংক্ষেপে 'ইসনা'-র প্রতিষ্ঠা হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গুরুত্ব ও দৈনন্দিন জীবনে তার প্রভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য শুধুমাত্র একটা সংস্থাই যথেষ্ট নয়, দরকার একটা মাধ্যমের। তাই ১৯৩৫ সালের জুন মাস থেকে 'ইসনার' মুখপাত্র হিসেবে একটি মাসিক পত্রিকা 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার'-এর সূচনা করা হয়। 'ইসনা'-র প্রথম সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তিনজন সহস-ভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া ষ্টীবামাইনের আবিষ্কর্তা স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, এবং এক ধনকুবের পক্ষীবিশারদ এস সি ল, দুজন সচিব ছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও অধ্যাপক বিধুভূষণ রায় এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক নিখিল রঞ্জন সেন।

সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকাটি প্রথমে মাসিক পত্রিকা ছিল, পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে এটি প্রতি দু মাসে একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হতে থাকে। আজও পর্যন্ত এই পত্রিকাটি কখনো অপ্রকাশিত থাকেনি। এই পত্রিকাটির ক্রমবর্ধমান শ্রীবৃদ্ধির জন্য পত্রিকাটির প্রথম দুই সম্পাদকের একজন মেঘনাথ সাহার অবদান অসামান্য। আমৃত্যু তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি প্রায় ২০০টি প্রবন্ধ এই পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিলেন অনেক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি যার মধ্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপকও আছেন, এই পত্রিকায় তাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

SCIENCE AND CULTURE

A Monthly Journal of Natural and Cultural Science.

Vol. XII JULY 1946—JUNE 1947 Nos. 1-1

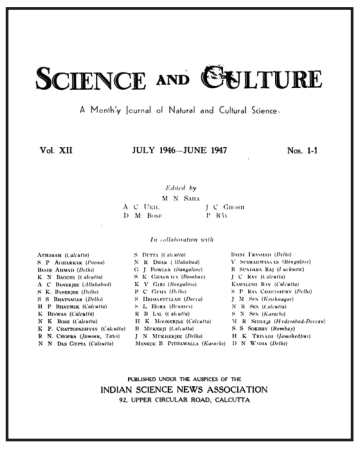

Edited by
M N SAHA
A C UKIL J C GHOSH
D M BOSE P RAY

In collaboration with

ATMARAM (Calcutta)	S DUTTA (Calcutta)	BAINI PRASHAD (Delhi)
S P AGHARKAR (Poona)	N R DHAR (Allahabad)	V SUBRAHMANYAN (Bangalore)
BASIR AHMAD (Delhi)	G J FOWLER (Bangalore)	B SUNDARA RAJ (Lucknow)
K N BAGCHI (Calcutta)	S K GHASWALA (Bombay)	J C RAY (Calcutta)
A C BANERJEE (Allahabad)	K V GIRI (Bangalore)	KAMALESH RAY (Calcutta)
S K. BANERJEE (Delhi)	B C GUHA (Delhi)	S P RAY CHAUDHURY (Delhi)
S S BHATNAGAR (Delhi)	S HEDAYETULLAH (Dacca)	J M SEN (Krishnagar)
H P BHAUMIK (Calcutta)	S L HORA (Benares)	N R SEN (Calcutta)
K BISWAS (Calcutta)	R B LAL (Calcutta)	S N SEN (Karachi)
N K BOSE (Calcutta)	H K MOOKERJEE (Calcutta)	M R SIDDIQI (Hyderabad-Deccan)
K P. CHATTOPADHYAY (Calcutta)	B MUKERJI (Calcutta)	S S SOKHEY (Bombay)
R N. CHOPRA (Jammu, Tawi)	J N MUKHERJEE (Delhi)	H K TRIVEDI (Jamshedpur)
N N DAS GUPTA (Calcutta)	MANECK B PITHAWALLA (Karachi)	D N WADIA (Delhi)

PUBLISHED UNDER THE AUSPICES OF THE
INDIAN SCIENCE NEWS ASSOCIATION
92, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার আর এক প্রচেষ্টা হিসেবে 'ইসনা' চৌত্রিশ বছর যাবৎ একটা "ট্রেনিং কোর্স অন সায়েন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যান্ড মি-ডিয়া প্র্যাক্টিস" পরিচালনা করছে। বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা এ কোর্সের মাধ্যমে বিজ্ঞান সা-ংবাদিকতায় হাতেকলমে শিক্ষা লাভ করে থাকে। ১৯৩৫ সালের ৯ ই জুলাই সায়েন্স কলেজের ক্যালকাটা ম্যাথমেটিকাল সোসাইটির সভাগৃহে 'ইসনার' প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। ওই মিটিংয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন যে 'ইসনার' আরও দুটি পরিকল্পনা আছে। প্রথমটি হল বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করা, আর দ্বিতীয়টি হল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করা। শর্ত ছিল প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য হলে এই পরিকল্পনাগুলোর রূপদান হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের অর্থাৎ ইসনার সে আর্থিক সামর্থ্য এখনো হয়নি। কিন্তু তাসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় ই-পেপার 'বিজ্ঞান কহনের' প্রথম সংখ্যা যে আমরা আজ প্রকাশ করছি তা সমস্ত বিজ্ঞান অনুরাগী ও ইসনার সমস্ত সদস্যদের কাছে আনন্দ ও গর্বের বিষয়। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের 'বিজ্ঞান প্রসার 'সংস্থাটির আর্থিক ও প্রত্যক্ষ যোগদানেই এই ই-পেপারটি প্রকাশ করা 'ইসনা' র পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সমস্ত মানুষের প্রতি 'ইসনা' র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

ভূতপূর্ব অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ
বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা
chakmanas09@gmail.com

শিশু বিজ্ঞানীর খোঁজে

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার,২০২১ তারিখে ওয়েবিনারের মাধ্যমে কলকাতার সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের সৌজন্যে এ রাজ্যে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৯তম কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকা, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান অনুরাগী জন, জেলা সমন্বয়ক ও অনেক সরকারি কর্মকর্তা। ওই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ড. আশীষ ব্যানার্জী। শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও তার সাধন নিয়ে দিক নির্দেশ করে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক আধিকারিক ড. দীপঙ্কর দাস। এরপর আরও অনেক বিশিষ্ট জন তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিশুর মনে ও মননে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের নানা সব উপায় ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। আগামী দিনে উৎসাহিত ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চার নানা সব প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরা হয় ওই অনুষ্ঠানে।

সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য দেওয়া এবং সুসংগত উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ে তোলার আশা রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রী অভিজিৎ বর্ধন মহাশয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মাইক্রো - স্কোপিক ওয়ার্ল্ড

মাইক্রো ফটোগ্রাফস: স্টিরিও মাইক্রোস্কোপের অধীনে বন্দী কিছু ছবি

১) মশার লার্ভা; ২) লাল পিঁপড়ের 'Compound Eye'; ৩) মাইক্রোস্কোপিক বাবেলস এর 'Self Assembly'; ৪) ছোলা গাছের 'Leaf Hair'

শিবশঙ্কর দাস ও বর্ণালী ভট্টাচার্য
রিসার্চ স্টুডেন্ট, অর্গানিক অ্যান্ড সাপ্রামলিকিউলার ল্যাব, আইআইএসইআর, কলকাতা ও ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিওলজি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা

বিজ্ঞান প্রসারে জে বি এন এস টি এস

তন্ময় পাল: বিগত ষাট বছর ধরে জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রতিভা অন্বেষণের কাজ করে আসছে। অতিমারীর করালগ্রাসে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র যখন প্রবলভাবে বিধ্বস্ত এবং বিদ্যালয় শিক্ষাঙ্গনে অনির্দিষ্টকালের জন্য পঠনপাঠন স্তব্ধ, তখন জে বি এন এস টি এস -জেলার তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষাকে উপলব্ধ করে তুলতে অসামান্য প্রয়াস ব্রতী হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর শিশুদের উৎসাহ তাদের এই প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। লকডাউনে গৃহবন্দি পড়ুয়াদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জে বি এন এস টি এস -এর পড়াশোনার এই বিকল্প ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। অতিমারীর বন্দিদশায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবাহ সচল রাখতে ও ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দিয়ে career হিসাবে বিজ্ঞানকে বেছে নিতে জে বি এন এস টি এস ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে ক্লাস করানো শুরু করেছে। এই গোটা কর্মকান্ডটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের অর্থানুকূল্যে সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদীয়া, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলার মোট কুড়িটি সরকারি অনুমোদিত বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে। জে বি এন এস টি এস নিজের উদ্যোগে প্রত্যন্ত মফঃস্বলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অন-লাইন ক্লাস করার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী, যেমন নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করেছে যাতে তারা নির্বিঘ্নে রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় আলোচনা করতে সক্ষম হয়।

কী কী শিখলো পড়ুয়ারা ? প্রত্যেকটি অনলাইন কর্মশালা দশদিন ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা, প্র্যাক-টিকাল ক্লাস করানো হয়। বিষয়ভিত্তিক পাঠ ছাড়াও হাতেকলমে ঘরোয়া সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেখান শিক্ষকরা। অষ্টম শ্রেণীর মফঃস্বলের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান বিদ্যালয় সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রসায়ণের ফর্মুলা, জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্ভিদের বর্ণনা, পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা, মানবদেহে কোষের বিন্যাস, খেলার ছলে পাটিগণিত, বীজগণিত প্রমুখ বিষয় প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে শেখানো হয় যা ছাত্রছাত্রীরা অনায়াশে বুঝতে করতে সক্ষম হয়েছে ।

জীববিজ্ঞানের পাঠ্য অন্তর্গত একটি পরীক্ষার কথা ধরা যাক। ছাত্রছাত্রীদের বলা হয় নিজের পরিবেশ থেকে কিছুটা মাটি জোগাড় করে রাখতে। এবার জনৈক শিক্ষিকা virtual platform এ প্রত্যেকটি মাটি বিশ্লেষণ করে ছাত্রছাত্রীদের সনাক্ত করতে শেখান। পড়ুয়ারা বিশদ বিভিন্ন মাটি যেমন এঁটেল মাটি, পলিমাটি, দোঁয়াশ ইত্যাদির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তারা নিজেরা পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করে ছবি তুলে বৈদ্যুতিন মাধ্যম (through Mobile phone) শিক্ষকদের কাছ পাঠায় আলোচনার জন্য।

রসায়নের (Chemistry) অন্তর্গত অম্ল এবং ক্ষার (acid and Alkaline reaction) সম্পর্কিত আরেকটি পরীক্ষার কথা বলা যাক। ছাত্র-ছাত্রীদের লিটমাস পেপারের বদলে হলুদ রঙের কাগজ ব্যবহার করতে বলা হয়। সেটা লেবুর রস লাল হয় এবং সাবানজল নীল হওয়া প্রত্যক্ষ কর - এই ঘরোয়া পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পদার্থের ধর্ম বুঝতে সক্ষম হয় ।পরিবেশ সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল titled: "একটি প্লাস্টিক বোতলের আত্মকাহিনী"। কিভাবে Plastic (প্লাস্টিক) এর অতিমাত্রায় ব্যবহার আমাদের সুস্থতা, জীববৈচিত্র ও বাস্তুতন্ত্রের উপর আঘাত করছে তা অনবদ্য উপস্থাপনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে দেখানো হয় যা বলাই বাহুল্য তাদের জ্ঞানের পরিধিকে অনেকমাত্রায় প্রসারিত করেছে ।

অতিমারীর কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ গৃহবন্দি থাকার দরুণ কিশোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসাদ সৃষ্ট হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের নির্মল মননে তা বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তাই তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হল কিভাবে নিজেকে ও সবাইকে ভালো রাখতে হয়। সাম-গ্রিকভাবে জে বি এন এস টি এস এর এই অসামান্য উজ্জ্বল প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক নূতন ক্ষেত্র রচনা করেছে যা তাদের বর্তমান অতিমারী সৃষ্ট অধ্যয়ণের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পূর্ণমাত্রায় সহায়তা করবে।

সায়েন্স কমিউনিকেটর
paultanmoy.08@gmail.com

সম্পাদকমণ্ডলী

সম্পাদক: প্রশান্ত কুমার বসু
যুগ্ম সম্পাদক: অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সদস্য: শ্রী পথিক গুহ, ড. নকুল পরাশর, ড . কে মুরলিধরন, ড. সুধেন্দু মণ্ডল, ড. মানস চক্রবর্তী, ড. বরুণ চ্যাটার্জি, ড. শ্যামল চক্রবর্তী, ড. অমিত কৃষ্ণ দে, ড. মানসপ্রতিম দাস, ড. সীমা মুখোপাধ্যায়, শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ, ড. মীনাক্ষী দে, ড. বুড়োশিব দাশগুপ্ত, ড. শঙ্করাশিস মুখোপাধ্যায়, ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, ড. সুমিত্রা চৌধুরী, ড. কালিপ্রসন্ন ধাড়া, ড. আশিস দাস, শ্রীমতী অর্পিতা চক্রবর্তী ও শ্রী রাতুল দত্ত

কারিগরি উপদেষ্টা: শিব শঙ্কর দত্ত

সহযোগী সম্পাদক
সুকল্যাণ গাইন, বর্ণালী ভট্টাচার্য, তুহিন সাজ্জদ সেখ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী দে, সূর্যানী চ্যাটার্জী, দেবশ্রী ঘোষ, জুনেদ জাভেদ, নিপা ব্যানার্জী, রিজয়ানা পারভিন, সুদীপ্ত ব্যানার্জী, বিভাস আদক, জিন্নাত আলি শেখ, মিজানুর রহমান শেখ, কৃষ্ণেন্দু রথ

নিবন্ধ পাঠানোর ই-মেল

bigyankahon@gmail.com

৩৪ তম ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন সায়েন্স কমিনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া প্র্যাকটিস,
ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন,
৯২, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৯
এর পক্ষে
ড. অমিত কৃষ্ণ দে ও ড. টি ভি ভেঙ্কটশরণ
কর্তৃক প্রকাশিত
ই-মেল- scie2224@dataone.in
website: www.scienceandculture-isna.org

© Copyright of ISNA can be reproduced with due acknowledgement to ISNA